এডিথ ইয়াংকে

অচ্ছুত পল্লী !

শহর আর ক্যান্টনমেন্টের গা ছুঁয়ে কিন্তু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে দু'সার মাটির ঘর...একে অপরের গায়ে হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে আলাদাভাবে গড়ে উঠেছে পল্লীটি। ধাঙড়, মুচি, নাপিত, ধোপা, ভিস্তিওয়ালা, মেথর—এমনি সব লোকের বাস এখানে···নীচের তলার 'জীবেরা' সব···হিন্দু-সমাজ যাদের দূরে ঠেলে দিয়েছে, অস্পৃশ্য, অশুচি, অপাঙক্তেয় ক'রে রেখেছে যাদের। সমাজের অচ্ছুত ব'লে এরা চিহ্নিত।

পল্লীটির পাশ ঘেঁষে বেয়ে চলেছে একটা সঙ্কীর্ণ মজা নদী। এককালে যখন এ নদী ছিল বহতা স্রোতস্বিনী, তখন এর জল ছিল স্বচ্ছ। আজ সরকারী টাট্টিখানার নোংরাতে এ মজা নদী ভরে থাকে। কর্দমাক্ত নদীটির দুই পাড়ে রোদে শুকোতে দেওয়া হয় সারি সারি কাঁচা চামড়া, এখানে ওখানে পড়ে থাকে মরা কুকুর-বেড়াল, আর তার পাশে রাজ্যের যত গোবর কুড়িয়ে গাদা ক'রে রাখা হয়েছে ঘুঁটের জন্য। সব কিছু মিলে একটা পচা, ভ্যাপসা গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে থাকে। দম আসে আটকে। তার উপর আবার বর্ষার জল জমা হয়ে এঁদো ডোবার সৃষ্টি হয়েছে। সেখান থেকেও আসছে একটা বিশ্রী পচা দুর্গন্ধ। এখানে ওখানে ছড়ান বিষ্ঠা আর গোবর···সর্বত্র নোংরামি আর কদর্যতার ছাপ। অপরিষ্কার আর অপরিচ্ছন্ন, দুঃখ আর দারিদ্র্যের নগ্ন চিহ্ন। সব কিছু নিয়েই গড়ে উঠেছে অচ্ছুতদের এই ঘিঞ্জি পল্লীটি। মানুষের বাসের পক্ষে অনুপযোগী। অস্বাস্থ্যকর।···

ধাঙড় বথাও তাই ভাবে।

শহর আর ক্যাণ্টনমেণ্টের ধাঙড়-সর্দারের ছেলে বখা। আঠারো বছরের শক্ত সমর্থ মরদ- পেটা শরীর। নদীর পাড়ে একেবারে শেষ মাথার তিন সার সরকারী টাট্টিখানার তদারকের ভার ওদের। বছর কয়েক হলো বখা কাজ করছে বৃটিশ ফৌজী ব্যারাকে ওর দূর সম্পর্কের এক খুড়োর সঙ্গে গোরা আদমীদের জীবনধারার জৌলুষ আর চাকচিক্য ওর উঠতি বয়সের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। বখার সমবয়সী অচ্ছুত-সঙ্গীরা কিন্তু নিজেদের বরাত নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। বখা তা পারলে না। ওর নিজেকে তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ, গায় গতরে বলিষ্ঠ বলে মনে হয়। কেবল মুচীদের ছেলে, ছোটা আর ধুপীদের রামচরণ যা একটু ব্যতিক্রম। মাথায় তেল মেখে সাহেবের মত একধারে লম্বা টেড়ি কেটে টো টো ক'রে ঘুরে বেড়ায় ছোটা। হকি খেলবার সময় সে হাফ্‌প্যাণ্ট পরে নেয়। গোরাদের মত দিব্যি সিগারেট ফোঁকে। আর রামচরণ ধোপা করে বখা আর ছোটার হুবহু নকল।

শরতের ভোরবেলা। ভিজে স্যাঁতস্যেঁতে মেজের উপর রঙচটা ছেঁড়া নীল শতরঞ্চির ওপর একখানা তেলচিটে পুরনো কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে শুয়ে বখা ভাবছিল তাদের ঘরের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার কথা। পাশের চারপায়ায় ওর ছোট বোনটি ঘুমিয়ে। কিছু তফাতে দড়ির ভাঙ্গা খাটিয়াতে ছেঁড়া তালি লাগানো খয়েরী রঙের লেপের নীচে ওর বাবা আর ছোট ভাইয়ের নাক ডাকছে।

হিমেল ঠাণ্ডা রাত। দিনে প্রচণ্ড গরম আর রাত্রে ভীষণ ঠাণ্ডা। বুলাশা শহর চিরকালই এরকম। কি শীত, কি গ্রীষ্ম—বখা সব সময় মিলিটারী পোষাক পরেই থাকে। ওভারকোট, ব্রীচেজ, পটি, বুট কোনোটাই বাদ দেয় না। রাত্রেও ঘুমোয় তাই পরে। কিন্তু শেষরাত্রের দিকে নদীর ওপার থেকে যখন ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়া বইতে শুরু করে, বখার পাতলা কম্বল আর

জামা কাপড় সে-শীত আটকাতে পারে না। তীক্ষ্ণ ধারাল চাবুকের মত হাড়-কাঁপানো হাওয়া এসে ধাক্কা দিয়ে নাড়িয়ে দেয় ওর ভেতর থেকে।

কাঁপতে কাঁপতে বখা পাশ ফিরে শোয়। কাঁপুক, দাঁতে দাঁতকপাটী লেগে যাক, 'ফ্যাশান' ছাড়তে রাজী নয় বখা। সৈন্যদের মত পাৎলুন, ব্রীচেজ, কোট, পট্টি আর বুট পরে ঘুরে বেড়ানটাই তো 'ফ্যাশান'। এর জন্যে অনেক কিছু ছাড়তে ও রাজী।

ইতিমধ্যে শেষরাতের কনকনে ঠাণ্ডায় ছেলের কাঁপুনি দেখে বাবা একবার মুখ ঝামটা, দিয়ে উঠেছিল :

'ভালো চাস্ তো গোরাদের ঐ পাতলা ফুরফুরে কম্বলটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দে। একখানা লেপ নিয়ে খাটিয়াটার ওপর উঠে শো। ঠাণ্ডায় জমে যাবি যে রে হারামী!'

বাবার কথা কানে তোলেনি। নয়া ভারতের নওযোয়ান তো বখা! বিলিতী পোষাকের চটকদার বাহার ওর মনে এমন ভাবে গেঁথে বসেছিল যে ভারতীয় বেশ-ভূষার সাদাসিদে ধরন আর পছন্দ হয় না ওর।

খুড়োর সঙ্গে বৃটিশ-ফৌজের ব্যারাকে নকৃরি করতে এসে প্রথম প্রথম ও টমিগুলোর দিকে হা ক'রে তাকিয়ে থাকত। ওর চোখদুটিতে বিস্ময় ছাপিয়ে উঠত। তাদের দৈনন্দিন জীবন ধারার খুঁটিনাটি সব কিছুই ও লক্ষ্য করত। দেখত : কেমন অদ্ভুত ক্যানভাসের নীচু খাটে তারা সব কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোয়, ডিম খায়, টিনের মগে ক'রে চা আর মদ গেলে ঢক্‌ঢক্ ক'রে, কুচকাওয়াজ করে, সিগারেট টানতে টানতে রূপালী ডাঁটওয়ালা ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বাজারে যায়। বখা সবই দেখত। তাদের মত ক'রে চলা-ফেরা করতে ওর ভয়ানক ইচ্ছে হতো। সে শুনেছিল, সাহেবরা হলো দুনিয়ার সেরা জীব, উপর তলার লোক। সাহেবদের মত জামা-কাপড় না পরলে চলে নাকি! তাই ও তাদের সব কিছুই অনুকরণ করতে চেষ্টা করত। চেষ্টা করত এ-দেশের সৃষ্টিছাড়া পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে যতখানি পারা

ধায় সাহেবদের অনুকরণ করতে। এক জোড়া পাৎলুন বখা একদিন চেয়ে নিল এক টমির কাছ থেকে। একজন হিন্দু সেপাইও পুরোনো একজোড়া বুট ও পট্টি দান করলেন ওকে। বাদ বাকী জিনিস সংগ্রহ করতে বখাকে অবশ্য ছুটতে হয়েছিল শহরের পুরনো কাপড়-জামা বিক্রির দোকানে। টমিদের কাছ-থেকে নিলামে-কেনা, পরিত্যক্ত কিংবা তাদের জীর্ণ খাকী রঙের পোষাক, লাল কামিজ, টুপী, ছুরি, কাঁটা, বোতাম, পুরনো বই···ইংরেজদের ফৌজী জীবনের খুঁটি-নাটি এটা-সেটা পাঁচ রকম সামগ্রী দিয়ে দোকানটি সাজানো। একটু বড় হয়ে বখা দোকানগুলোর সামনে এমনি ঘোরা-ফেরা করত, বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত। ভেতরে ঢুকে এটা-সেটা নাড়াচাড়া ক'রে দেখতে তার ইচ্ছে হোত। কিন্তু সাহসে কুলোত না। কেননা, দোকানে ঢুকে কোনো কিছু জিনিসের দর জানতে চাইলেই দোকানী এমন একটা চড়া দাম হাঁকবে যা দেওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব। তা ছাড়া ও যে ধাঙড়দের ছেলে, অচ্ছুত, লোকটা টের পেয়ে যাবে। তাই এতদিন শুধু দোকানটার সামনে ঘোরা-ফেরা করত। ভেতরকার চোখ-ধাঁধানো হরেক রকমের পণ্যগুলির দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকত। ভাবত: সাহেবদের মত ও তো চলা-ফেরা করে, এখন তাদের মত অনেকটা দেখায়ও তাকে। কিন্তু তাদের মত পকেটে পয়সা কোথায়?

বখার মনে প্রশ্ন জাগে। রঙিন স্বপ্নটা বুঝি ওর ভেঙ্গে যায়। ভয়ানক দমে যায়। মনমরা হয়ে পা বাড়ায় ঘরের দিকে। তারপর একদিন বখার কপালটা ফিরে গেল। বৃটিশ-ব্যারাকের কাজটা সে পেয়ে গেল। তলবের পুরো অঙ্কটা অবশ্য বাবার হাতেই ওকে তুলে দিতে হতো। কিন্তু টমিদের কাছ থেকে বকশিস ও যা পেত, তাও নেহাৎ কম নয়, প্রায় দশ টাকার মত। পুরনো কাপড়-চোপড়ের দোকান থেকে ওই টাকা কয়টা দিয়ে অবশ্য খুশীমত সব জিনিস কেনা যায় না। তবু একটা জ্যাকেট, একটা ওভারকোট আর রাত্রে ও যে কম্বলখানা গায় দেয় সেখান কিনে নিয়েছিল। এছাড়াও এক

প্যাকেট 'লাল-লণ্ঠন' সিগারেট কিনবার মত আনা কয়েক পয়সা ওর হাতে উদ্বৃত্ত থাকত প্রতি মাসে। ওর বাবা ভীষণ রেগে যেত। বলত: 'অপব্যয়— দু'হাতে খালি পয়সা ওড়ান!' অচ্ছুত পল্লীর অন্য ছেলে-ছোকরারাও ওকে টিটকিরি দিত, হাসাহাসি করত ওর নতুন সাজ-পোশাক নিয়ে। এমনকি ছোটা আর রামচরণও ওকে ছাড়ত না। ওকে ডাকত: 'নকলী পিল্‌পিলি সাহেব' বলে। ওর পরনের একমাত্র সাহেবী পোশাক ছাড়া এক বর্ণ সাহেবীয়ানা যে ওর মধ্যে নেই, একথাও বখাও জানত। কিন্তু তাই বলে হাল ছাড়ল না ও। দিন-রাত সব সময় ও ওর নতুন-কেনা সাহেবী পোষাকে সেজে-গুজে থাকত। শীতে হু হু ক'রে কাঁপলেও রাত্রে কোনোদিন দেশী লেপ গায়ে দিত না। চলত ভারতীয়ানার সব রকমের ছোঁয়া বাঁচিয়ে।

শিরশিরে হিমেল শিহরণ জাগে বখার দেহে। সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে ওঠে। ও পাশ ফিরে শোয়। রাতগুলো কি ঠাণ্ডা! সত্যি দুঃসহ! দিনের বেলাটাই ভাল লাগে বখার। চারদিকে কেমন ঝকঝকে রোদ। হাতের কাজগুলো সেরে নিয়ে পোষাক ঝেড়ে-মুছে ও তখন পথে বেরিয়ে পড়তে পারে। ওকে দেখে ওর সঙ্গীদের চোখ টাটিয়ে ওঠে। কেনই বা উঠবে না? অচ্ছুত পল্লীর ও হলো পাণ্ডা। কিন্তু সারা রাতটা কি ভাবে যে কাটে! 'নাঃ, আর একখানা কম্বল না কিনলে চলছে না, বাবার কাছে তা হলে লেপের জন্যে মুখ ঝামটাও শুনতে হয় না। চব্বিশ ঘণ্টা মুখে গালাগাল লেগেই আছে বুড়োর! সব কাজটাই তো করে ও, পুরো তলবটা কিন্তু মেরে দেয় বুড়ো! সেপাইদের কি ভয়টাই না করে বুড়ো! তাদের কাছ থেকে ওকে গাল শুনতে হয় সব সময়। আমাকেই মিছিমিছি গালাগাল খেতে হয়। সেপাইরা বাবাকে একবার জমাদার বলে ডাকলে কি খুশীটাই যে হয় বুড়ো! গলা বাড়িয়ে বড়াই করতে থাকে নিজের ইজ্জতে! শুধু কি তাই? বস্তির সবার কাছ থেকে সেলাম কুড়িয়ে বেড়ানটাও চাই। একটা মুহূর্ত যদি হাত পা গুটিয়ে একটু জিরোতে পারতাম! এত করেও কিন্তু

কপালে গালি-গালাজ আর হয়রানির শেষ নেই। পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে একটু খেলতে গিয়েছি, অমনি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি শুরু ক'রে দিলে। খেলা ফেলে ছোট টাট্টিখানা সাফ করতে। বুড়ো হয়ে গেল, তবু যদি একটুখানি জানত সাহেবদের হালচাল! বাইরে এই ঠাণ্ডা, আর বুড়ো ব্যাটা চেঁচাচ্ছে আমায় বিছানা ছেড়ে উঠবার জন্য! আমি এখন ছুটি টাট্টি পরিষ্কার করতে আর উনি দিব্যি আরামে লেপের তলায় নাক ডাকাবেন! ছোটভাই রথা আর বোন সোহিনীও ঘুমুচ্ছে দিব্যি নাক ডাকিয়ে।...'

বখার কালো, চ্যাপ্টা, চওড়া মুখে বিরক্তি ফুটে ওঠে। তবু ও কান খাড়া ক'রে শুয়ে থাকে। এখুনিই হয়ত হাঁক-ডাক তর্জন-গর্জন শুরু ক'রে দেবে ওর বাবা। বিছানা ছেড়ে উঠবার জন্য পেড়াপীড়ি করবে।

বুড়োর নাক ডাকার শব্দ থেমে যায়।

'ও বখিয়া হারামীর বাচ্চা, ওঠ না!' বাপের বাজখাই গলা ছিটকে আসে গুলির মত: 'ওরে ওঠ, টাট্টিগুলো সাফ ক'রে আয়। সেপাই লোক নইলে যে গোসা হবে রে—'

প্রত্যেকদিন ঠিক এ সময়টা ঘুম ভেঙ্গে যাবে বুড়োর। ওকে ডাকাডাকি করবে। তারপর যথারীতি ছেড়া তালি-লাগান তেল চটচটে লেপের তলা থেকে নাসিকা গর্জন শোনা যাবে তার।

বাপের ডাক শুনে বখা একবার আড় চোখে তাকাল। মাথা তুলবার চেষ্টা করল একবার। কিন্তু সকাল বেলায়ই মিছিমিছি গাল খেয়ে ওর মেজাজটা চটে গেল। ক্রুদ্ধ আক্রোশে মুখখানা ওর থমথমে বিবর্ণ হয়ে গেল।

অনেকদিন আগেকার কথা ওর মনে পড়ে। মনে পড়ে, মা যেদিন মারা গেল সেদিনের সকালের কথা। সেদিনও বখা এমনি চোখ বুঁজে আরাম ক'রে শুয়েছিল। বাবা ভাবলে ও বোধহয় জেগে নেই। তাই ওকে জাগাবার জন্য সেদিনও এমনি ক'রে হাঁকা-হাঁকি ডাকা-ডাকি করছিল বাবা। ভোরবেলায় বাবার এ হাঁকা-হাঁকির প্রথম সূত্রপাত হয় সেদিন

থেকেই। প্রথম প্রথম ও অবশ্য শুনে না-শোনার ভান ক'রে পড়ে থাকত। কানেই তুলত না বাপের ডাক। সকাল সকাল ও যে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না, তা নয়। সকালে উঠবার অভ্যেসটা ওর অনেক দিনের। মা-ই ক'রে দিয়ে গেছে।

শোবার ঘরের এক কোণে দু'খানা ইঁট পাতা উনুনের উপর রোজই চায়ের জন্য জল গরম হতো। ঘুম থেকে উঠলেই মা এসে পেতলের গেলাশে খানিকটা চা ঢেলে দিত। টাটকা গরম চায়ের স্বাদটা যে কি চমৎকার লাগত! সেকথা ভাবতেই ঘুমোবার আগে জিভে জল এসে পড়ত বথার। চা খেয়ে নিয়ে জামা-কাপড় পরে ও বেরিয়ে পড়ত টাট্টি-সাফের কাজে। বথার তখন ফুর্তি দেখে কে! এমনি এক সকালে মা হঠাৎ মারা গেল। সংসারের সব ঝক্কি এসে পড়ল ওর ঘাড়ে। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে গেলাশ ভর্তি চা-ই বা আজকাল আর কে দেয়? বিনা চায়েই এখন চালিয়ে যেতে হয়। আগের দিনের কথা মনে পড়লে ব্যথায় মন টন টন ক'রে ওঠে। গরম চায়ের সঙ্গে জলখাবারের কথাই নয় শুধু, অনেক কিছুই ওর মনে পড়ে। সত্যি, তখন কি আরামেই না দিন কাটত। কোনো ভাবনা চিন্তা ছিল না। মা কেমন চমৎকার জামা কাপড় কিনে দিত ওকে। প্রায়ই সহরে নিয়ে যেত। হেসে খেলে পরম নিশ্চিন্তে ওর দিন-গুলো কেটে যেত।

মার কথা ওর প্রায়ই মনে পড়ে। কালো, বেঁটে খাটো গড়ন। পরনে মাত্র সাদা-সিদে একটা জামা, একজোড়া ঢিলে পায়জামা, মাথায় একখানা ওড়না। তাই পরেই মা রান্না-বান্না, মাজা-ঘষা, ঘরের যাবতীয় কাজ ক'রে যেত। মা ওর সাহেবী বেশ-ভূষা বরদাস্ত করতে পারত না। কিন্তু মুখে কিছু বলত না। কি উদার! মার কাছে হাত পেতে কোনদিন তাকে বিমুখ হতে হয় নি। মূর্তিমতী করুণাময়ী ছিল মা।

মা আজ নেই। তবু কেন জানি বথার কোন দুঃখ হয় না মার জন্য। মার অভাব ও বুঝি অনুভব করে না। সত্যি, সাহেবী হাল-চাল পোষাক-পরিচ্ছদ

আর 'লাল-লন্ঠন' সিগারেট নিয়ে যে জগতে ছিল তার বিচরণ, সে-জগত আর মায়ের মাঝে ছিল বিরাট ব্যবধান, এক সীমাহীন দূরত্ব।

'বেজন্মা! আরে, তুই উঠলি?' আবার খেঁকিয়ে ওঠে বাবা। হাঁপানী রুগীর কাশির প্রবল তোড়ে হাঁক ফেটে পড়ে।

বখা কোন সাড়া দেয় না। পাশ ফিরে শোয়। মনে মনে বুড়োর উদ্দেশে গালাগাল করে। শরীরটাও আজ ওর ভাল ঠেকছে না, জ্বর জ্বর মনে হয়। মনে হয়, হাড়গুলো সব যেন শরীরের ভেতরে নড়েচড়ে উঠছে। চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, নাকের রন্ধ্র ফুলে উঠছে, জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। গলাটাও কফে রুদ্ধ হয়ে আসছে। ভেতরটা গুর্ গুর্ করছে। খুক্ খুক্ ক'রে বার কয়েক কেশে বখা গলাটা পরিষ্কার করে নিল। খুক ক'রে কফটা ফেললে ঘরের এক কোণে। তারপর কনুইয়ের উপর ভর ক'রে উঠে বসে বিছানার চাদরেই নাকটা ঝাড়ল। শীত শীত করছিল। কম্বলখানা গায়ের উপর টেনে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

'ও বখিয়া! বখিয়া! ওরে, নচ্ছার হারামী ব্যাটা, কানে ঢুকছে না? আমায় একটা টাট্টি সাফ ক'রে দিয়ে যা না শিগ্‌গির!' উচ্চ কণ্ঠে বাইরে কে একজন হেঁকে উঠল।

এবার উঠতে হলো। কম্বলখানা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে হাত-পাগুলো টান টান করে আড় ভাঙল। দু'হাত দিয়ে চোখদুটো কচলাতে কচলাতে হাই তুলল। তারপর উঠে বসল। ঘর তো নয়, খুপরী। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম সবই ওর মধ্যে। কম্বল আর শতরঞ্জি গুটিয়ে না রাখলে নয়। বিছানাটা তুলে রাখবার জন্য বখা নীচু হলো। কিন্তু পরক্ষণেই বাইরের হাঁকাহাঁকি শুরু হবার ভয়ে ছুটল দরজার দিকে।

বাইরে দাঁড়িয়েছিল খড়ম পায়ে এক বেঁটে খাটো রোগা ব্যক্তি। বাঁ হাতে তার পেতলের ছোট লোটা। মাথায় সাদা টুপী। কোমরের কাপড় কোনোমতে জড়ান, প্রায় উলঙ্গই বলা যায়। ঐ কাপড়ের এক কোণা

আবার টেনে এনে নাকের ওপর টিপে ধরেছে। হাবিলদার চারৎ সিং। ৩৮ নং ডোগরা রেজিমেন্টের নাম করা হকি খেলোয়াড়। লোকটি যেমন সরল তেমনি রসিক। নিজের পুরনো অর্শরোগের কথা নিজেই বলে বেড়ায় সকলের কাছে।

'টাট্টিখানা সাফ করিস নি কেন রে, হারামজাদা! কার বাপের সাধ্যি যে ও-পাশে ঘেঁষে? সব কটার এক অবস্থা। তোদের জন্যই হারামজাদা আমার এ অর্শরোগ। সময়মত পরিষ্কার করবি না— !'

ঝাড়ু আর বুরুশটা দেয়ালের এক কোণে গোঁজা ছিল। সেগুলো নামাতে নামাতে বললে বখা:

'এই যে হাবিলদারজী, আমি এক্ষুনি সাফ ক'রে দিচ্ছি।' ঘাড় গুঁজে বখা আপন মনে কাজ ক'রে চলে। খোলা দরজা বিশিষ্ট এক একটা পায়খানা থেকে অপর পায়খানায় ছুটে ঝাড়ু দিয়ে মেঝে ঘষে, ফিনাইল ঢেলে ক্ষিপ্র গতিতে হাত চালিয়ে পরিষ্কার করে চলে। শরীরের প্রত্যেকটা পেশী ওর ফুলে ওঠে।

'ভারী পাকা ওস্তাদ তো জমাদারটা!' বখাকে কাজ করতে দেখে হয়ত প্রশংসা করবে কেউ। পায়খানা পরিষ্কারের কাজ চব্বিশ ঘণ্টা করেও ও নিজে নোংরা হয়ে থাকে না।

'কেন যে ও করতে যায়? এসব নোংরা কাজকর্ম কি ওর জন্যে?' ভাবে বখা। বাবুরা বলে: 'ধাঙড় বেটারা হলো ছোট লোক—নোংরা জাত। পাশ ঘেঁষে কার বাপের সাধ্যি! কিন্তু বখাটা অমন নয়। ভারী চালাক ছেলে।—'

হাবিলদার চারৎ সিং পবিত্র হিন্দু ধর্মের জারক রসে জারিত। সকল ছোঁয়াছুঁয়ির উর্ধ্বে। পায়খানায় একবার ঢুকলে পাক্কা আধ ঘণ্টার আগে বেরুবার জো নেই। দীর্ঘ সময়টা পায়খানার মধ্যে জ্বালা-যন্ত্রণায় কাটিয়ে চারৎ সিং বেরিয়ে এসে বখাকে দেখে রীতিমত তাজ্জব হয়ে গেল।

ছোট জাত; তবু দেখ কেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন! চারৎ সিং কেমন যেন আত্ম-সচেতন হয়ে উঠল। কুলীন বামুনদের সংস্কারের মোহ কাটিয়ে উঠতে সে এখনো পারেনি। তবু বখাকে দেখে প্রশান্ত মুখে একটু হাসল। বলল :

'ওরে বখিয়া! তুই যে দেখছি রীতিমত ভদ্দোরলোক বনে যাচ্ছিস! অমন পোষাক পেলি কোথায় রে?'

লজ্জায় বখার মাথাটা নুয়ে এল। সত্যি, ছোট জাত হয়ে বড়ো লোকদের মত অমন বাবুগিরি করার অধিকার কি আছে ওর? ঢোক গিলে একান্ত বিনীত ভাবে বলল :

'হুজুর, এ সব তো আপনাদেরই মেহেরবানি!'

ছ'হাজার বছরের ঘুনে-ধরা শ্রেণী ও বর্ণ বৈষম্যের মোহপাশ কাটিয়ে উঠতে না পারলেও চারৎ সিং-এর মনটা আদ্র' হয়ে উঠল। সে জানত ছোকরাটা ভালো খেলতে পারে। তাই বলল :

'বখা, আজ বিকেলে আসিস, তোকে একখানা হকি ষ্টিক দেব।'

বখা সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়াল। অবাক হয়ে গেল। চারৎ সিং বলে কি? রেজিমেণ্টের সেরা হকি খোলোয়াড় চারৎ সিং। আপনা থেকেই একখানা হকি ষ্টিক উপহার দিতে চাইছে! 'হকি ষ্টিক। সত্যি! আপন মনে ভাবতে থাকে বখা। কৃতজ্ঞতায় মনটা ওর গলে যায়। বাপ-ঠাকুর্দার কাছ থেকে বখা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে এসেছে নতশির হীন দাসত্বের রক্তধারা। পেয়েছে নিপীড়িত নির্যাতিত উপেক্ষিত মানব-আত্মার অক্ষম দুর্বলতা; পেয়েছে হঠাৎ-একটু স্নেহ-করুণার ছোঁয়া পেলে বিগলিত নিঃস্ব কাঙাল মানবের একান্ত অসহায়তা, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত কোনো এক গোপন ইচ্ছা পুরণের অপ্রত্যাশিত প্রতিশ্রুতিতে লেজ-নাড়া রাস্তার কুকুরের মত নিষ্ক্রিয় আত্মতুষ্টি। চারৎ সিং-এর উদার অকুণ্ঠ প্রতিশ্রুতি বখার সেই রক্ত-ধারার অণু-পরমাণুগুলোয় অণুরণন জাগাল।

কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে ও ওর পরম হিতাকাঙ্ক্ষীকে নমস্কার জানাল। ঘাড় গুঁজে আবার আপন কাজে মন দিল।

ওর ঠোঁটের কোণে একটু স্মিত হাসির রেখা ফুটে উঠল। প্রভুর কাছ থেকে দুটো মিষ্টি কথা শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে ক্রীতদাস যেমন হাসে ঠিক যেন সেই হাসি। বখা গান গেয়ে উঠল গুন গুন ক'রে। একটার পর একটা পায়খানা ছুটে ছুটে পরিষ্কার ক'রে চলল। এক সময়ে ওর গানের কলি বেশ দূর থেকেও শোনা যায়। কাজে ওর ক্লান্তি নেই। সমানে কাজ ক'রে চলেছে। মাথার টুপীটা একবার মাত্র আল্‌গা হয়ে খুলে পড়েছিল আর ওর ওভারকোটের একটা পুরনো বোতাম খুলে গিয়েছিল। ঢিলে পোশাকটা কোনো রকমে সামলে নিয়ে ও কাজ ক'রে চলেছে আপন মনে।

বিরাম নেই; একজনের পর একজন আসছে টাট্টিখানায়। অধিকাংশই হিন্দু। পরনে মাত্র একখানা গামছা। হাতে পিতলের লোটা, বাঁ কানে পৈতেটি গোঁজা। মাঝে মাঝে দু'একজন মুসলমানও আসছে। গায়ে সুতোর লম্বা সাদা চোগা। পরনে ঢিলে পায়জামা আর হাতে মস্ত তামার বদ্‌না।

বখা একটু দম নেয়। কপাল বেয়ে টস্ টস্ ক'রে ঘাম পড়ছে। জামার আস্তিন দিয়ে ঘাম মুছে নিল। একটা উষ্ণ শিহরণ জাগে বখার সর্বাঙ্গে। অরামের ছোট্ট নিশ্বাস ঝড়ে পড়ে ওর বুক থেকে। নতুন উদ্যমে ও আবার কাজে মন দেয়। টাট্টিখানার শেষ প্রান্তে এসে আপন মনে ও ভাবে: 'এই তো প্রায় শেষ ক'রে এলাম। কাজকে কি আর ভয় পাই! সত্যি, চুপচাপ হাত পা গুটিয়ে কেউ কি আর বসে থাকতে পারে?' কাজের পুরস্কার হলো প্রচুর স্বাস্থ্য—সত্যি, কাজ শেষ করার পরে কি আরাম! কি অপূর্ব মাদকতা! একটানা তাই ও কাজ ক'রে চলে। হাত-পাগুলো ওর কন্‌কন্ ক'রে উঠত। হাঁপিয়ে উঠত অনেক সময়। তবু কাজে ওর ক্লান্তি নেই।

সকাল থেকে দু'দুবার পরিষ্কার হয়ে গেল। তৃতীয়বার টাট্টিখানার শেষ মাথার কাছাকাছি এসে পৌছতেই বধার কোমরটা ধরে গেল। পিঠটা কনকন ক'রে উঠল। শিরদাঁড়াটা টান ক'রে উঠে দাঁড়াল পূবের শহরের দিকে মুখ করে। ঝাপসা ধোঁয়াটে ঘন কুয়াশা ছেয়ে আছে চারিদিকে। আবছা আবরণ ভেদ ক'রে দৃষ্টি চালিয়ে দেখল, অর্ধ-উলঙ্গ হিন্দু সেপাইরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে টাট্টিখানার দিকে। যাদের কাজ সারা হয়ে গেছে তারা এখন নদীর ধারে বসে কাদা দিয়ে লোটা মাজছে। কেউ কেউ নদীর জলে নেমে পড়ে টেনে টেনে 'ভজ রাম নাম' গাইতে শুরু ক'রেছে। নদী থেকে নরম মাটি তুলে কেউ কেউ হাত রগড়াচ্ছে। কেউবা হাত মুখ ধুচ্ছে; কেউবা দাঁতন করছে। সশব্দে কুলকুচি করছে কেউ। কেউবা প্রচণ্ড শব্দে নাক ঝাড়ছে। বৃটিশ ব্যারাকে কাজ করতে যাবার পর থেকে বধা দিশী লোকদের স্নান, হাত-পা ধোয়া, কুলকুচি করার ধরন দেখে লজ্জা পেত। কেননা, টমিরা যে ওসব কোনটাই পছন্দ করে না! ওর বেশ মনে পড়ে দিশী লোক দেখলেই সাহেবরা বলে ওঠে: 'কালা আদমী, জমিন পর হাগনেওয়ালা।' কিন্তু নিজেরা যখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে টবে স্নান করতে যায়? হোক না সাহেব। তাই বলে নিজের মনের কাছে অত রেখে ঢেকে তো আর কথা কওয়া যায় না! সত্যি কি লজ্জার কথা!—বধা আপন মনে বলে। লজ্জায় ওর মাথাটা পর্যন্ত হেঁট হয়ে আসে। সাহেবরা যা করবে সবটাই 'ফ্যাশান' আর এদেশের লোকেরা কিছু একটা করলেই অমনি ওরা হলো 'নাটুস—ন্যাটিভ।'

হিন্দুরা জলে নেমে নাভির কাপড়খানা একটু ঢিলে ক'রে প্রথমেই খানিকটা জল ঢেলে শুরু করে ভজন গাইতে; তারপর আপাদমস্তকে জল ঢালতে শুরু করে। বধা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, ওর মজা লাগে। আর মুসলমানরা মসজিদে ঢোকার আগে মুখ-হাত ধুয়ে ওজু ক'রে যখন আলখাল্লার মধ্যে দু'হাত বিশ্রীভাবে ঢুকিয়ে ছোটে, ওর কেমন যেন লাগে। আচ্ছা, নমাজ করতে গিয়ে ওরা অতবার উঠবোসই বা করে কেন? যেন আখড়ায় রীতিমত ব্যায়াম করছে! মনে পড়ে,

আলিকে একবার ও জিজ্ঞেস করেছিল কথাটা। আলির বাপ রেজিমেণ্টে ব্যাণ্ড বাজায়। আলি কিন্তু কোন জবাব দেয়নি, চটে গিয়েছিল। বলেছিল, বখা, তাদের ধর্ম তুলে কথা বলছে। ধর্মের নিন্দা করছে।

বখার আরও মনে পড়ে, সকাল হতে না হতেই শহরের বাইরে খোলা মাঠে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে সবাই বসে যায় দলে দলে কাপড় খুলে। 'কি বেহায়া সব। সত্যি ওদের কি একটু লজ্জাও করে না?' মনে মনে ভাবতে থাকে বখা: 'রাজ্যশুদ্ধ লোক যে দেখছে, এতটুকু খেয়াল আছে সে দিকে? এজন্যই তো গোরাগুলো বলে: কালা আদমী, জামিন পর হাগনেওয়ালা। লোকগুলো তো এখানেও আসতে পারে? না-না, বাপস্!' বখা পরমুহূর্তেই আবার শুধরে নেয়। সবাই যদি এখানকার টাট্টিখানায় হানা দিতে শুরু করে, তাহলেই হয়েছে আর কি। সাফ করতে করতে ওর জীবন শেষ। রাস্তা ঝাড়ু দেওয়ার কাজটা অনেক ভালো, অনেক সহজ। ফাওড়াখানা আর ঝাটা নিয়ে রাস্তা থেকে খালি গরু আর ঘোড়ার নাদাগুলো তুলে নেওয়া আর রাস্তার ধুলোগুলো একবার ঝাট্ দেয়া,—ব্যাস। সে-কাজ বুড়ো বাপই করে। ওরও করতে ইচ্ছা হয়।

'একটা পায়খানাও যদি পরিষ্কার থাকত। ওরে, তোরা কি সব বেগার খাটিস নাকি? মাইনে পাস না?'

বখা চমকে ওঠে। দেখে কটমট করে তাকিয়ে আছে রামানন্দ মহাজন। দক্ষিণ দেশী, ভাষায় গালের ফুলঝুরি ছুটছে তার শ্রীমুখ দিয়ে। যেমন তেল-কুচকুচে কালো, তেমনি আবার খিটখিটে। কানে তার এক জোড়া মুক্তা বসানো সোনার কুণ্ডল। পরনে সাদা ফিনফিনে মিহি ধুতি। গায়ের পিরানটা মহাজনের বিপুল ভুঁড়িটাকে কোনোমতে ঢেকে রেখেছে। মাথায় এক বিরাট পাগড়ী।

'মহারাজ!' দু'হাত জড়ো ক'রে বখা প্রণাম জানাল রামানন্দকে। তারপর সোজা ছুটল টাট্টিখানার দিকে।

একবার কাজ করতে লেগে গেলে বখার কোনোদিকে আর হুশ থাকে না। সব কিছু ও ভুলে যায়। এবার নিয়ে চারবার হলো। তবু মিনিট-পনরোর মধ্যে টাট্টিগুলো ওকে যে আবার পরিষ্কার করতে হবে, কথাটা ওর খেয়ালে ছিল না। কপাল বেয়ে টস্ টস্ ক'রে ঘাম পড়ছিল। কপালের ঘামটা মুছবার ফুরসৎ পায় না। বেলা যে কত হলো কে জানে?

বাড়ীর কাছে চিম্‌নি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। বখার নজর পড়ল তার ওপর। ধোঁয়া দেখেই ওর পরবর্তী কাজের কথা মনে পড়ে গেল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওদিকে পা বাড়াতে হলো ওর। ফেওড়াখানা তুলে নিতে একবার শুধু থামল। নোংরা পোড়ানোর জন্যে পিরামিড্ ধরনের শান বাঁধানো চুল্লীটার ছোট মুখে খড় ভর্তি করতে লাগল।

ময়লা শুদ্ধ খড়ের গুঁড়ো বাতাসে উড়তে লাগল। বখার কাপড় জামায় উড়ে এসে পড়ছে কিছু কিছু। যেগুলো একটু ভারী সেগুলো ছিট্‌কে পড়ছে মাটিতে। ঝাড় দিয়ে সেগুলো আবার জড়ো ক'রে চিম্‌নির মুখে ঠেসে দিতে লাগল। আপন মনে কাজ ক'রে চলেছে বখা। এমনিধারা কাজ সে ক'রে চলেছে আজ কতদিন। এই তো ওর কিসমৎ! যে নোংরা পরিবেশে নোংরা কাজ ওদেরকে হামেশা করতে হয় তার জন্য আত্মভোলা না হ'লে কি আর উপায় আছে? ভুলে থাকাটাই তো সহ্যঅনুভূতির ওপর একমাত্র আবরণ। ময়লা নোংরা খড়-কুটোয় ভর্তি হ'য়ে উঠেছিল চুল্লীটা, তবু বখা চুল্লীটার মুখে খড় ঠেসে দিতে লাগল। একটা কাঠি জেলে ও খড়টায় আগুন ধরিয়ে দিল। দপ্ ক'রে জলে উঠল আগুন। তার লক্‌লকে লেলিহান জিহ্বা বাড়িয়ে দিয়ে খড়ের গাদাটার এখানে-ওখানে যেন চাট্‌তে লাগল। আগুনের রক্তিম সোনালী শিখায় চারদিকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।

বখা চুল্লীটার মুখের কাছে দাঁড়িয়েছিল। আগুনের আঁচ এসে লাগছিল ওর গায়ে।

ওর গোলগাল কালো মুখখানি অদ্ভুত রকমের সুন্দর দেখাচ্ছিল।

সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির জন্য ওর শক্ত দেহটা বেশ মনোহর সুশ্রী হয়ে উঠেছে, দেখলেই চোখদুটি জুড়িয়ে যায়। ইচ্ছে করে বলতে : হ্যাঁ, শরীরখানা বটে !' আজন্ম টাট্টি ঘাটা আর নোংরা কাজ ক'রে এলেও কদরটা যেন ওর বেড়ে ওঠে।

বেশ খানিকটা সময় লাগবে। চুল্লীর ময়লাটা পুড়ে নিঃশেষ হ'তে মিনিট বিশেক যাবে। তবু ওর ক্লান্তি বোধ হয় না। আগেকার কাজের তুলনায় এটা তো কিছুই নয়।

ময়লাশুদ্ধ খড়গুলো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বধা চুল্লীর মুখটা বন্ধ ক'রে দিল। কাজ সেরে ও এবার ফিরে চলল। জায়গাটা চিমনির চাপ চাপ ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে। ওর গলা শুকিয়ে গিয়েছে, ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে। ঠোঁট দুটো শুকিয়ে উঠেছে। হাতের ঝাড়ু-ঝুড়ি আর বুরুশটা জায়গা মতো রেখে দিয়ে পরনের কাপড়-চোপড়টা ঝেড়ে মুছে ও এবার ওর আস্তানার দিকে পা বাড়াল। তেষ্টায় ছাতিটা প্রায় ফেটে যাবার মতন হয়েছে। ঘরের এককোণে বাসনপত্রগুলো সব জড়ো ক'রে রাখা আছে। ওগুলোর ওপর চোখ পড়তেই ওর ভয়ানক চা খেতে ইচ্ছে হলো। আবছা অন্ধকারে ঘরটার চারদিকে একবার চোখ দুটি বুলিয়ে নিল। দেখল, ছেঁড়া বিবর্ণ লেপখানায় আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে তখনও নাক ডাকাচ্ছে বাবা। ভাইটি কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। বধা জানে এই সময়টা কোথায় কাটিয়ে দেয় ভাইটি। রাস্তার পাশের ময়দানে নিশ্চয় খেলছে। ও দেখে ঘরের এক কোণে দু'খানা ইটের উনুনে বোন সোহিনী আঁচ দেবার চেষ্টা করছে। ভিজে মাটির মেঝের ওপর উপুড় হ'য়ে বসে পাছাটা কিছুটা তুলে নিচু হ'য়ে সে উনুনটায় অবিরাম ফুঁ দিয়ে চলেছে। তা'র মাথাটা মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। সে কেবল ফুঁ দিয়েই চলেছে। ভিজে কাঠে কি আর অত সহজে আগুন ধরে ? শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। একান্ত নিরুপায় হ'য়ে সে হাল ছেড়ে দিল। এমন সময় পেছনে শুনতে পেল দাদার পদধ্বনি। সোহিনী পেছনে

ফিরে তাকাল। চোখ দুটো তা'র ছল্ ছল্ ক'রছে। দাদাকে দেখে এবার গণ্ড বেয়ে অশ্রু নামল।

'তুই ওঠ, আমি ধরিয়ে দিচ্ছি।'

বথা ঘরের কোণে গিয়ে হাঁটু ভেঙে বসল। উনুনটা একবার নাড়া দিল দু'হাতে। তারপর ঝুঁকে পড়ে গাল ফুলিয়ে ফু দিতে লাগল। যেন একটা কামারের হাফর। ভিজে কাঠগুলো উনুনটায় দপ্ ক'রে জ্বলে উঠল। বথা এবার হাঁড়িটা চাপিয়ে দিল উনুনের উপর।

'আ-হা। হাঁড়িতে পানি নেই যে—'সোহিনী বলে ওঠে।

'দাঁড়া, কলসী থেকে আমি পানি ঢেলে আন্‌ছি।'

'কলসীতেও তো পানি নেই।'

'উস্—!' বথার ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠ থেকে ছোট একটা দীর্ঘনিশ্বাস ঝরে পড়ে।

'দাঁড়াও ভাইয়া, আমি চট ক'রে গিয়ে পানি নিয়ে আসছি।' আর্দ্র কণ্ঠে বললে সোহিনী।

'বেশ, যা।' বলে বথা বাইরে গিয়ে বসল ভাঙা বেতের চেয়ার খানার উপর। একদা ইংরেজদের মতো জীবন যাপন করতে সাধ ছিল তার। বেতের এ চেয়ারখানা তাই ও সংগ্রহ করেছিল। ঘরের খাস বিলিতি ধরনের আসবাবপত্রের মধ্যে ওই চেয়ারখানাই যা একমাত্র নিদর্শন। সোহিনী জলের খালি কলসীটা মাথায় বসিয়ে হন হন ক'রে বেরিয়ে গেল দাদার পাশ দিয়ে।

গোলাকার মাথার ওপর গোলাকার পাত্র আপনা থেকে খাড়া রাখা যায় কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরুনগে ইউক্লিড আর আর্কিমেডিসের মতো বড় বড় পণ্ডিতেরা। সোহিনী অতশত ভাবে না। মাথার উপর জলের কলসীটা দিব্যি বসিয়ে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কেল্লা-ইঁদারার উঁচু উঁচু ধাপগুলো বেয়ে উঠে বসে রইল এক ফোঁটা জলের জন্যে তীর্থের

কাকের মতো। বসে রইল কোনো সহৃদয় জাত-হিন্দুর আসার পথ চেয়ে। ওপাশ দিয়ে যাবার সময় দয়া ক'রে যদি খানিকটা জল তুলে ঢেলে দিয়ে যান তার কলসীতে।

একহারা গড়ন সোহিনীর। রোগা নয় সে, তার সুঠাম দেহের পরিধির মধ্যেই যেন সর্ব অবয়ব পূর্ণ বিকশিত। তার কৃশ কটি বেড় দিয়ে পীনজঘন আবৃত ক'রে নেমে এসেছে পাজামার :ভাঁজগুলো। উপরে মসলিনের জামার নিচে কাচুলিহীন কুচ যুগল চলার ছন্দে ঈষৎ কম্পমান। হেল্‌তে দুলতে দুলতে চলেছে মেয়েটি, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে বখা। সত্যিই সোহিনী সুন্দরী।

ইঁদারার চারদিকে ঘেরা উঁচু বাঁধানো রোয়াক ছুঁয়ে দাঁড়াবার অধিকার নেই অচ্ছুৎদের। জল তুলবার জন্য ইঁদারার পাড়ে গেলেই সর্বনাশ। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা অমনি চিৎকার ক'রে উঠবে: 'আরে গেল, গেল, জলটা নষ্ট হয়ে গেল!' এমন কি পাশের নদী থেকেও ওরা জল নিতে পারে না। তাতেও নাকি নদীর জল অপবিত্র হয়ে যায়। বুলাশারের মতো অমন একটা পাহাড়ী শহরে এক-একটা ইঁদারা খুঁড়তে খরচ পড়ে কমসে কম হাজার খানেক টাকা। আর নিজেদের জন্য ইঁদারা করবার অত টাকাই বা ওদের মতো গরীবদের কোথায়? ওদের কোন ইঁদারা ছিল না। তাই বাধ্য হয়েই জাত-হিন্দুদের কুয়োর কাছে এসে ধর্ণা দিতে হয়। তীর্থের কাকের মতো হা ক'রে বসে থাকতে হয় কেউ যদি এসে দয়া ক'রে ওদের কলসীতে একটু জল ঢেলে দিয়ে যায়। প্রত্যেক দিন সকালে এমনি ভাবেই ওদের কলসী ভরে জল নিতে হয়, রান্না-বান্না আর স্নানের জল সংগ্রহ ক'রে ধ'রে রাখতে হয় জালায় ক'রে। অবশ্য জালা কিনবার মতো পয়সা ওদের সবারই আছে। আর যারা জালা কিনতে পারে না কিংবা যারা খোলা-মেলা জায়গায় স্নান করতে ভালোবাসে তারা তখন আসে নাইতে ইঁদারার ধারে। ইঁদারার পাড়ে শান বাঁধানো উঁচু বেদীর উপর ওরা এসে জটলা পাকাতে থাকে সকাল, দুপুর, আর রাত্রি —সব সময়ে। ওপাশ দিয়ে কাউকে যেতে দেখলে দু'হাত জোড় ক'রে

এক ফোঁটা জলের জন্য অনুনয়-বিনয় করে। ওদের প্রার্থনা শুনে পথিক যদি পাশ কেটে চলে যায়, ওরা নিজেদের ভাগ্যকেই ধিক্কার দিতে থাকে, আর যদি কোনো উদার পথচারী ওদের কাতর নিবেদনে সাড়া দেয়, ওরা তখন মুখর হয়ে ওঠে পথিকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায়। দু'হাত তুলে ভগবানের কাছে তাঁর মঙ্গল কামনা করে।

সোহিনী ইদারার ধারে এসে দেখল, তাদের বস্তির জনা দশেক লোক ইতি-মধ্যেই এসে বসে আছে। কিন্তু জল তুলে দেবার লোক কেউ নেই। সারাটা পথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছে সোহিনী। মনে মনে তার এ আশঙ্কাটাই ছিল। যা ভিড়, কে জানে, কতক্ষণ তাকে ঠাঁই বসে থাকতে হবে। একটু দমে গেলেও সে আশা ছাড়ল না। হলই বা একটু ভিড়, দশ জনের পর তারই তো পালা আসবে। হাজার হোক, সে তো মেয়ের জাত। সে কি বুঝতে পারছে না, এক ফোঁটা জলের জন্য তার দাদা কি রকম কষ্টই না পাচ্ছে! তেষ্টায় নিশ্চয় ছাতিটা ফেটে যাচ্ছে। সমস্ত সকাল হাড়ভাঙা খাটুনিতে দাদা হাঁপিয়েও উঠেছে। মায়ের মমতায় তার মনটা ভরে গেল। মায়ের মতনই সন্তানের খাদ্য আহরণের জন্য সে যেন ছুটে এসে বসে আছে জলের প্রতীক্ষায়। অনেকের সঙ্গে এক সারিতে বসল সোহিনী। মনটি তার কেঁদে উঠছে। মা'গো, একটু জল তুলে দেবার কেউ নেই আজ। চাপা, শান্ত স্বভাবের মেয়ে সোহিনী। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেও ধৈর্য হারাল না।

গুলাব সোহিনীকে আসতে দেখেছিল। ও হল ধুপীদের বাড়ীর গিন্নী, দাদার বন্ধু রামচরণের মা। মাঝ-বয়সী; গায়ের রঙ বেশ ফরসাই! একদা যৌবনে পরমা সুন্দরী বলে খ্যাতি ছিল। ভাঁটার মুখে আঁট-সাঁট দেহ-সৌষ্ঠবের দিকে তাকালে আজও তা বেশ বোঝা যায়। এখন মুখে খাঁজ পড়েছে আর তা ঢাকবার চেষ্টারও অন্ত নেই। সেজে-গুজে সব সময় সে বসে থাকে আপন সৌন্দর্যের ঢাক পিটিয়ে। শুধু তাই নয়। ছেনালিপনাতেও সে বড় কম যায় না। দেমাকের চোটে মাটিতে পা পড়াও তার ভার

অবশ্য তার কারণও আছে। নীচু জাতের লোকদের মধ্যে ধুপীরা আবার জাতে বড়। কলকে তাদেরই সর্বাগ্রে। আবার শহরের নাম-করা জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক একদা যুবতী গুলাবের পায়ে মন-প্রাণ দেহ সর্বস্ব সঁপে দিয়েছিলেন। এখনও যৌবনের লীলাসঙ্গিনীকে ভুলতে পারেন নি ভদ্রলোক। ভুলতে পারেন নি তাঁর প্রৌঢ়া প্রেয়সীকে।

সোহিনীরা ছোট জাত, অচ্ছুৎদের মধ্যেও আবার ছোট জাত, একেবারে নীচের ধাপের লোক। গুলাব তাদের অবজ্ঞার চোখে দেখবে এতে আর বিস্ময়ের কি! কিন্তু ধাঙড়দের নিরীহ শান্ত শিষ্ট মেয়েটি যে দিন দিন শশীমুখীর মতো রূপ-লাবণ্যে বেড়ে উঠছে! ওর সুকুমার মুখখানি দেখলেই গুলাবের সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে ওঠে। যেন ঘৃতাহুতি হয় আগুনে। ঈর্ষায় পুড়তে থাকে সে। ধাঙড়দের মেয়েটা বুঝি তার ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বী! ঈর্ষায় বুক মোচড় খেয়ে ওঠে। গুলাব অনেক সময় নিজেও এর কারণ ভেবে পায় না। তবু তার অচেতন মনের কোণায় নিরীহ মেয়েটির প্রতি চটুল উপহার আর লঘু বাক্য-বাণের কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হতে থাকে।

'যা-যা, বাড়ী যা,' গুলাব বিদ্রূপে ফেটে পড়ে: 'আমরা সেই কখন থেকে বসে আছি, এক ফোঁটা জল এখনও পেলাম না। আর উনি এসেছেন জল নিতে! যা, তোকে কেউ জল তুলে দেবে না।'

সোহিনী একটু হাসল। হেসেই গড়িয়ে দিতে চাইল বর্ষীয়সী গুলাবের বিদ্রূপ। ভিড়ের মধ্যে থুরথুরে এক বুড়ো ছাড়া অপর কোন পুরুষ মানুষ ছিল না। তাই কাউকে দেখতে না পেয়ে সে মুখের ঘোমটা চোখ বরাবর ঈষৎ টেনে দিল। কলসীটাকে আগলে নীরবে বসে রইল।

'অমন আদিখ্যেপনা তোরা কেউ দেখেছিস লা?' তাঁতি-বৌ ওয়াজিরো বসেছিল গুলাবের পাশে। গুলাব তার গায়ে পড়ে বললে: 'কাণ্ড দেখেছিস লো, ধাঙড়দের ওই নচ্ছাড় মেয়েটা মাথায় কাপড় না দিয়েই শহর আর ক্যান্টনমেণ্টময় ঘুরে বেড়ায় পই পই ক'রে।'

গুলাবের ধারাল জিভের কথা তো ওয়াজিরো জানত । সোহিনীর বিরুদ্ধে তার কোন আক্রোশ নেই। তবু গুলাবের কথায় সায় দিতে হয় তাকে। আকাশ থেকে পড়াব ভান ক'রে তাকে বলতে হল :

'তাই নাকি ?' তারপর সোহিনীর দিকে চোখ ঠেরে বললে : 'তোর লজ্জা করে না রে একটু ?'

ওয়াজিরোর ভাবখানা দেখে সোহিনীর ভীষণ হাসি পেল। আত্ম-সংবরণ করতে না পেরে ফিক্ ক'রে সে হেসে ফেলল।

'দেখলি তো, দেখলি তো তোরা। পথের কুত্তি! ছেনাল ছুঁড়ি! মাকে খেয়েছিস তো এই সেদিন। আমি না তোর মায়ের বয়েসী। আমার মুখের অপর ওমন দাঁত বার ক'রে হাসতে তোর লজ্জা করে না লা ? পথের কুকুর। কসবী কোথাকার।' ধুপী গিন্নী ফেটে পড়ল আগুন হয়ে।

সোহিনী গুলাবের থাপ-ছাড়া গালিগালাজের ধরন দেখে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।

'আরে, পথের কুত্তি! আমাকে কি তুই সঙ্ পেয়েছিস ? অত হাসছিস কেন লো ছুঁড়ি ?' গুলাব চারপাশে তাকাল একবার। তারপর দলের সেই থুরথুরো বুড়ো আর ছেলেপিলেদের দিকে আড় চোখে একবার তাকিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল : 'অতগুলো বেটাছেলের সামনে দাঁত বার ক'রে হাসতে তোর লজ্জা করে না, ওরে কসবী বেটি ?'

ধুপী গিন্নী যে হাড়ে হাড়ে চটে গিয়েছে, সোহিনীর এবার খেয়াল হল। কিন্তু ধুপী গিন্নীর কাছে যে কি অপরাধ সে করল, ভেবে পেল না। সে-ই তো অকারণ খুঁত ধরে মুখে যা আসে তাই না বলে ওকে গালগাল দিলে। ও কি আর পড়ে পড়ে কোন্দল করতে গিয়েছিল ? আপন মনে ভাবল সোহিনী।

'কসবী, পথের কুত্তি। এ্যাঁ, কথা ক'স না যে বড়। মুখে এখন রা নেই কেন ?'

'দেখো, খামকা আমায় গাল দিয়ো না। আমি তোমায় কি বলেছি?' সোহিনী এবার মুখ খুলল।

'না, বলে নি। তবে চুপ করে আছিস কেন লা, বেজন্মা কোথাকার। ধাঙড়ের ঘরে জন্মেছিস, সারাদিন গু-মুত নিয়ে পিণ্ডি চটকাস, তবু তোর আক্কেল হয় না? তোর মায়ের বয়েসী আমি, আমাকে অপমান করার মজাটা আজ টের পাইয়ে দিচ্ছি, দাঁড়া।'

গুলাব হাত তুলে সোহিনীর দিকে তেড়ে গেল।

ওয়াজিরো ছুটে এসে গুলাবকে ধরে ফেলল।

'আঃ, করো কি, করো কি। না, মেরো না ওকে।' ওয়াজিরো গুলাবকে ধরে তার স্বস্থানে বসিয়ে দিল।

সহসা ভিড়ের মধ্যে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে গেল। তীর্থের কাকের মতো ক্ষুদ্র দলটি মুখর হয়ে উঠল। পরস্পর তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। ঘৃণা আর বিরক্তির ঝাঁজ ফুটে উঠল তাদের মুখে। সোহিনী গোড়ার দিকটায় একটু ভয় পেয়েছিল। মুখখানা শুকিয়ে তার শাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তবু চুপ করে বসে রইল। সব ঝড় ঝাপটাকে গড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল নিস্পৃহ উদাসীনতার মুখোশ এঁটে। মুখ ফিরিয়ে এক সময় সে তাকাল আকাশের দিকে। মুখের হাসিটুকু তার মিলিয়ে গেল। কেমন এক নিরানন্দে মনটা তার ছেয়ে গেল। ব্যথায় টন টন করে উঠল বুকটা। ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়ল। অনুতাপে বুকটা ভরে উঠল কানায় কানায়। মাথার উপরে সূর্যদেব সামনে খর রোদের তীব্র বর্ষণ ক'রে চলেছেন। যতই বেলা বাড়ছে গুলাবের গায়ে-পড়া ঝগড়া-ঝাঁটির রেশটুকু মন থেকে তার নিঃশেষে মুছে গেল। মনের পটে দাদার ঘর্মাক্ত সকরুণ মুখখানি ভেসে উঠল। সারাটা সকাল হাড়-ভাঙা খাটুনির পর চা খেতে বাড়ি ফিরেছিল বেচারা। তেষ্টায় ছাতিটা নিশ্চয় ফেটে যাচ্ছে। তবু যদি আশেপাশে কোন জাত-হিন্দুর দেখা পাওয়া যেত...

চারিদিক নিস্তব্ধ। গুলাবের নাকের ফোঁস-ফোঁসানিই কেবল নিথর নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিচ্ছে।

'আজ আমার ছোট মেয়েটার সাদি। অমন শুভ দিনটাকে কিনা ধাঙড়দের অলক্ষুণে মেয়েটা পণ্ড ক'রে দিলে!' গুলাব একটানা আপসোস ক'রে চলল। দলের কেউ কিন্তু কান দিল না তার কথায়। এমন সময় দূরে জাত-হিন্দু এক সেপাইকে দেখা গেল। বেশ দেরী করেই সে টাট্টিখানায় চলেছে। তারা সকলে চিৎকার ক'রে অনুনয় করল জল তুলে দিতে।

সেপাইটা নৃশংস না পামর? কি জানি, হয়ত আসতে পারছে না। ইঁদারার পাড়ের সমবেত এতগুলো লোকের কাতর আবেদন-নিবেদনে কর্ণপাত না ক'রে সে হন্ হন্ ক'রে চলে গেল।

সেদিন অচ্ছুৎদের বরাৎটা ভালই বলতে হবে। সেপাইটাব পিছু পিছু আরেকজন জাত-হিন্দুকে এদিক পানে আসতে দেখা গেল। ইনি আবার কেউ-কেটা লোক নন। স্বয়ং পণ্ডিত কালীনাথকে দেখতে পেয়ে অচ্ছুৎরা বিপুল উৎসাহে ফেটে পড়ল।

পণ্ডিতজী থমকে দাঁড়ালেন। খাঁজ কাটা হাড়-বহুল ফোকলা গাল। ভুরু কুঁচকে চোখ তুলে তিনি তাকালেন অচ্ছুৎদেব দিকে। অস্থি-চর্মসার দেহ। তবু তাঁর শুকনো হাড়-কটা ওদেব কাতর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারল না। একে খিটখিটে বদ্ মেজাজী বুড়ো, তার ওপর একটানা কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে ভুগে ভুগে মেজাজটা তার ভয়ানক তিরিক্ষি হয়ে গিয়েছিল। একটু জল তুলে দেবার জন্য অচ্ছুতদের সকরুণ কাকুতিতে তিনি হয়ত বড় একটা কানই দিতেন না যদি না তাঁর মনে হতো ইঁদারা থেকে জল তুললে তাঁর পুণ্য হবে।

ইঁদারার উঁচু শান বাঁধান মঞ্চের দিকে ধীরে ধীরে তিনি পা বাড়ালেন। তাঁর মন্থর সতর্ক পদক্ষেপ। আর কুঞ্চিত মুখমণ্ডলের দিকে তাকালে কারো বুঝতে এতটুকু দেরী হবে না যে পেটের মধ্যে তাঁর কি ভয়ানক তোলপাড়ই না হচ্ছে। আপন মনে তিনি ভাবলেন: 'গতকালের নিমন্ত্রণটাই হয়েছে

কাল আমার। খেয়েই পেটটা কেমন টিম টিমে ঢোল হয়ে উঠল। খাবারের দোকানে দুধ আর যে জিলিপীগুলো খেলাম, তাতেই এ দশা হলো কিনা কে জানে। না! লালা বানারসী দাসের বাড়ির ব্রাহ্মণ ভোজনটাই বোধহয় এর মূলে। নেমন্তনটা খাবার পর থেকেই যত গোলমাল শুরু হয়েছে।' ধর্মভীরু বড় লোকদের বাড়িতে চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ভুঁবি ভোজনের স্মৃতিগুলি রোমন্থন করতে লাগলেন সেবায়েৎ ঠাকুর: 'আহা পায়সান্নটা কি চমৎকারই না হয়েছিল! স্বাদটা যেন মুখে এখনও লেগে আছে। আর 'কারা-পেরসাদ্'—সেই যে সুজির পিঠে—ঘিয়ের গন্ধ মৌ মৌ করছে—গরম গরম মুখে দিলে অমনি সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। যতই খাওনা কেন, বসে হুঁকোটায় নিশ্চিন্তে দুটো টান দিতে পারলে সব বেমালুম হজম হয়ে যাবে। কিন্তু আজ সকালে হলো কি! ঝাড়া ঘণ্টা খানেক হুঁকো টানলাম। আশ্চর্য, এখনো কোন বেগই নেই!' পণ্ডিত কালীনাথ ভাবতে ভাবতে হাতের পিতলের লোটাটা ইঁদারার পাড়ের কাঠের ছোট্ট গর্তের মধ্যে রাখলেন।

তীর্থের কাকের মতো অচ্ছুৎরা এদিকে ভাবল জল তুলে দেবার নাম শুনেই বামুন পণ্ডিত বুঝি চটে গেছেন। মুখে তাই অমন বিরক্তির ছাপ। তারা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও একবার জানতে পারল না যে কোষ্ঠকাঠিন্য আর হাড়জিরজিরে কৃশ দেহে উৎসাহরসের একান্ত অভাবই যত সব অনিষ্টের গোড়া। অবশ্য বুঝতে খুব বেশি দেরীও হলো না। কেননা, একটু ইতঃস্তত করেই পণ্ডিত কাশীনাথ বাল্তিটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন। তারপর সেটা কপিকলের সঙ্গে একগাছা শণের দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে ইঁদরার মধ্যে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিলেন। ভারী বালতি, হাত থেকে ফস্কে গিয়ে দড়িসমেত ঘুরতে ঘুরতে সশব্দে জলের উপর পড়ে গেল। কপিকলের. আকস্মিক হেঁচ্কা টানে পণ্ডিত কালানাথ প্রথমটায় কেমন একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলেন। কিছুটা টাল সাম্লে উঠে পূর্ণোদ্যমে তিনি জল তোলার কাজে মন দিলেন।

জলভরা ভারী বালতিটা টেনে তুলতে হলে খানিকটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কসরৎ দরকার। কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সারা জীবনভর একটানা পূজো-আর্চা ক'রে এসেছেন, মন্ত্রপাঠ তুকতাক কিংবা খাগের কলম দিয়ে ঠিকুজি পত্র লিখেছেন। তাই একটুকুতেই তিনি আবার হাঁপিয়ে ওঠেন। তবু সর্বশক্তি দিয়ে তিনি কপিকলের হাতল ঘুরাতে লাগলেন। মুখখানা তাঁর কুঁচকে উঠল। আনন্দোদ্ভাসিত খাঁজও বুঝি পড়ল একবার মুখে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত ক'রে ইঁদারা থেকে জল তোলার ফলে পেটের ফাঁপাটা অনেকটা যেন কমে গেল। বহুদিন এমন সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। এদিকে জল-প্রত্যাশী অচ্ছুৎরা নিজেদের কলসী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে রীতিমত কাড়াকাড়ি হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে কে আগে কলসী রাখবে—আগে কে এগিয়ে যাবে সহৃদয় মহান্ ব্যক্তিটির কাছে।

শান বাঁধান ইঁদারার পাড়ে পণ্ডিত কালীনাথ বালতিটা টেনে তুললেন। কিন্তু পেটের মধ্যে তাঁর মহা আলোড়ন শুরু হয়ে গিয়েছে। কেমন একটু বিমনা হয়ে পড়েছেন ব্রাহ্মণ সহসা এক উষ্ণ তরঙ্গ তাঁর কুক্ষিদেশ থেকে তলপেটের অধঃস্থল পর্যন্ত ধীরে ধীরে যেন খেলে গেল। নাভির উপরটায় মুচড়ে উঠল। বহুদিনই এমনটি হয়নি। সহসা তাঁর কোমরের ডান্ পাশে ধারাল বর্শার ফলক কে যেন সজোরে বিঁধিয়ে দিল। এর পর যা হয়, প্রকৃতির অমোঘ আহ্বানে নিজেকে খোলসা করবার জন্য তিনি মহা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন।...

'আমি পেথম, পণ্ডিতজী, আমিই পেথম।' ধুপী গিন্নী গুলাব সহসা চিৎকার ক'রে উঠল ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে। পণ্ডিত কালীনাথ নিজেকে নিয়েই বিব্রত ছিলেন। গুলাবের চিৎকারে বিরক্তই হোলেন। কটমট ক'রে তাকালেন তার দিকে। তার ধার করা কাজব চাউনি পীড়িত পণ্ডিতের মনে কোনো দাগই কাটল না।

'না-না, আমিই পয়লা এসেছি—' ভিড়ের মধ্য থেকে চেঁচিয়ে উঠল একটি ছোট ছেলে।

'ওর আগেই তো আমি এসেছি।' অপর কে একজন চিৎকার করলে। বাঁধভাঙ্গা জলের মতো সবাই ছুটল ইঁদারার দিকে। অন্যদিন হ'লে ঠাকুরমশাই রেগেমেগে ওদের গায়ের উপর জল ঢেলে একটা কাণ্ড ক'রে বসতেন। কিন্তু অচ্ছুৎদের কাতর কাকুতিতে যেমন তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন, তেমনি চাঁদ-পনা মুখের অমোঘ আকর্ষণে পণ্ডিত কালীনাথ ধরা দেন না বললে ভুল বলা হবে। দলের সবাই ইঁদারা ঘিরে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল। সোহিনী কিন্তু ভিড় ছেড়ে কিছু তফাতে গিয়ে চুপচাপ বসেছিল। পণ্ডিত কালীনাথের চোখ মন এমন সময় গিয়ে পড়ল ওর উপর। তিনি দেখেই ওকে চিনে ফেললেন। ধাঙড়দের সুন্দরী মেয়েটাকে তিনি অনেকবার দেখেছেন শহরের অলি-গলিতে টাট্টিখানা পরিষ্কার করতে। ডবকা ছুঁড়ি, আঁট-সাট গড়ন। পীন-পয়োধরের কৃষ্ণকালো বৃন্ত জোড়া গায়ের পাতলা জামার বাঁধ ভেঙ্গে যেন বেরিয়ে পড়ছে। পণ্ডিত কালীনাথের শরীর আজন্ম ভুগে ভুগে রোগে ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছিল। মনটাও ভেঙ্গে গিয়েছে। ভক্ত আর শিষ্যবৃন্দের উপর একটানা খবরদারি করতে করতে পণ্ডিতজী লজ্জার বালাই চুকিয়ে দিয়েছেন। সোহিনীর সরল নিষ্পাপ চোখ দুটি ব্রাহ্মণের মনে কী এক অনুভূতি জাগিয়ে দিল যা তাঁর শারীরিক দুর্বলতার জন্য সাধারণভাবে কঠিন হয়ে গিয়েছে, মনটিও গিয়েছে কুকড়ে। সোহিনীর প্রতি এক অসীম করুণায় তিনি গলে গেলেন।

'ওঃ, তুই লখার বেটী না? আয়, আয় এদিকে আয়।' পণ্ডিত কালীনাথ মুখর হয়ে উঠলেন। বললেন: 'তুই তো বেশ চুপচাপ বসেছিলি দেখছি; শাস্ত্রে কি বলে জানিস? ধৈর্য ধরে থাকলেই বর মেলে। আরে ভাগ ভাগ পথের কুত্তা সব। কি গোলমালটাই না শুরু ক'রে দিয়েছে। দূর হ' এখান থেকে।'

'কিন্তু পণ্ডিতজী—' সোহিনী থতিয়ে উঠল। বামুন ঠাকুরের সপ্রশংস দরাজ দাক্ষিণ্যের উপেক্ষায় নয়, ওর আগে যারা এসেছিল তাদের ভয়েই।

'আরে, আয় না!' পণ্ডিত কালীনাথের পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠতেই তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন। সুন্দরী মেয়ের জন্য কিছু একটা ক'রে দিচ্ছেন বলে মনে মনে আনন্দিতও হন তিনি।

সোহিনী ঘাড় গুঁজে এগিয়ে এল। কলসীটা শান-বাঁধান মঞ্চের নীচে রাখল। ঠাকুর মশাই দু'হাতে জলের বালতিটা তুলে ধরলেন। দম বুঝি প্রায় আটকে আসছিল। কিন্তু সোহিনী পাশে দাঁড়িয়ে আছে কথাটা ভাবতেই কোথা থেকে তাঁর দেহে এল উৎসাহের নতুন জোয়ার। কিন্তু সে শুধু ক্ষণিকের। পরমূহূর্তেই ঘুণেধরা দুর্বলতাই পেয়ে বসল তাঁকে। হেঁচকা টানে জলের পাত্রটা ঢালতেই খানিকটা জল ছলাৎ ক'রে ছিটকে গেল। অচ্ছুৎরা চারদিক থেকে ছুটে আসছিল, অনেকেই ভিজে গেল।

'ভাগ্, ভাগ্, সব!' সোহিনীর কলসীতে জল ঢালতে ঢালতে পণ্ডিত কালীনাথ খেঁকিয়ে উঠলেন। গাল-মন্দের বেড়া-জালে নিজের পঙ্গুত্বকে ঢাকবার চেষ্টা করলেন তিনি। সোহিনীর কলসীটা কানায় কানায় ভরে গেল। 'হ্যাঁরে, এবার হলো?' জলের খালি বালতিটা হাতে ক'রে পণ্ডিত কালীনাথ জিজ্ঞেস করলেন সোহিনীকে। তাঁর তোবড়ানো গালে হাসিব রেখা ফুটে উঠল।

সোহিনী কলসীটা মাথায় তুলবার জন্য বাইরের দিকটা মুছে নিচ্ছিল, ঘাড় নেড়ে চাপা গলায় উত্তর দিল: 'হ্যাঁ পণ্ডিতজী—'

'মন্দিরের উঠোনটা তুই ঝাড় দিতে যাস না কেন রে?' সোহিনী চলে যাচ্ছিল। পণ্ডিতজী ডেকে জিজ্ঞেস করলেন: 'তোর বাপকে বলিস আজ থেকে যেন তোকে পাঠিয়ে দেয়।'

স্মরাতুর দৃষ্টি ফেলে কালীনাথ তাকিয়ে রইলেন অপস্রিয়মানা সোহিনীর পেছনে। চট ক'রে পারলেন না সরিয়ে নিতে সে-দৃষ্টি। কেমন যেন অপ্রতিভ ভাব। রক্তে বইতে শুরু করেছে কামনার স্রোত আর সেই সঙ্গে চলেছে পণ্ডিত কালীনাথের অন্তরে তাঁর কঠিন কৌলিন্য বোধের সংঘাত।

আসিস রে, আজই আসিস্!' স্পষ্টভাবে বললেন কালীনাথ যাতে মন্দির-প্রাঙ্গণে আসতে ভুল না হয় সোহিনীর।

সোহিনী তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের কথা ভুলতে পারল না। সলজ্জভাবে মাথা নুইয়ে সে বাড়ির পথে পা বাড়াল। বাঁ হাতখানা তার কোমরে আর ডান হাত মাথার কলসীতে। চলার ভঙ্গীতে ছন্দিত হয়ে উঠছে গানের সুর।

ধুপী গিন্নী কটমট করে তাকাল তার দিকে। চোখ দুটিতে যেন আগুনের হল্কা। সকলের সঙ্গে সেও কখন ইঁদারার ধারে এসে পড়েছিল। অপর আরেক জন জাত-হিন্দুকে দেখতে পেয়ে ইঁদারার পাড়ে সবাই তখন একত্র জল তুলে দেবার জন্য প্রার্থনা করতে লাগল।

নতুন আগন্তুকের নাম লছমন। হিন্দু ভিস্তিওয়ালা। ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাতে কি! জাত-হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি রান্না করা, জল-তোল', বাসন ধোয়া ঘরের এটা-ওটা আরও নানা ধরনের ছোট কাজ সব তাকে করতে হয়। ছাব্বিশ বছরের যোয়ান মরদ। বুদ্ধিমানও। তবে সর্বদা মাজা-ঘষার নোংরা কাজ ক'রে ক'রে হাত-পাগুলো কেমন হাজায় এরই মধ্যে রুক্ষ হয়ে গিয়েছে। কাঁধে রয়েছে একখানা বাঁশের বাঁক।

ইঁদারার পাড়ে এসে লছমন কাঁধের বাঁকটা মাটিতে নামিয়ে রাখল। তারপর দু'হাত জোড় ক'রে প্রণাম করল পণ্ডিতজীকে। লছমন তাঁর হাত থেকে বালতি কেড়েই নিল। বলল: 'দিন, আমায় দিন পণ্ডিতজী, আমিই আপনাকে জল তুলে দিচ্ছি।'

ভারী বালতিটা সে ইঁদারার মধ্যে অবলীলাক্রমে ছুঁড়ে দিল। তারপর সেটা টেনে তুলতে তুলতে অপস্রিয়মানা সোহিনীর দিকে একবার তাকাল আড়চোখে। সোহিনীর দিকে তার যে ইতিপূর্বে নজর পড়েনি এমন নয়। ওকে দেখলেই সর্বাঙ্গে তড়িৎ প্রবাহের মত এক অপূর্ব শিহরণ খেলে যায়। ভীরু দ্বিধা সংকোচ বক্ষে নিয়ে সুদূর কোনো প্রেয়সীর প্রতি দু'হাত বাড়িয়ে যেন ধেয়ে

যেতে ইচ্ছে করে। পরক্ষণেই সে আবার গুমরে ওঠে আপনার পঙ্গুতার কথা স্মরণ ক'রে।

সোহিনী জল নিতে এলে ওর সঙ্গে দেখা হলেই লছমন মাঝে-মধ্যে ওকে ঠাট্টা-মসকরা না ক'রে ছাড়ত না। ওকে অকারণ ক্ষেপিয়ে তুলত। সোহিনীও কোনো-দিন হয়ত সলজ্জ হাসি হাসত একটু তার দিকে চেয়ে। দু'একটা চটুল চাহনিও হয়ত উপহার দিত কোনোদিন। আর তাতেই লছমন আর পাঁচটি প্রেমিকের মত বলে বেড়াত সোহিনী ওকে জানে-প্রাণে নিয়ে নিয়েছে।

সোহিনীর দিকে আড়-চোখে তাকাতে গিয়ে সে পণ্ডিতের কাছে ধরা পড়ে গেল। মহা অপরাধীর মত সে অমনি নিজের সলজ্জ চোখ দুটি সরিয়ে নিয়ে ঘাড় গুঁজে হাতের কাজে মন দিল। এক হেঁচকা টানে জল-ভরতি ভারী বালতিটা সে তুলল কুয়োর পাড়ে। প্রথমেই সে পণ্ডিজীর ছোট্ট পিতলের লোটাটায় জল ভরে দিয়ে বাকীটা ঢেলে দিল গুলাবের কলসীতে। অসশেষে কিছু কিছু দিল বাকি সকলের পাত্রে।

সোহিনী এক সময় কখন হারিয়ে গেল তার মনের মুকুর থেকে।

ওদের মাটির ঘরের যে কোণায় সোহিনী রান্না করতো, ও এসে দাঁড়াল সেখানে। বাবা তখন ছেঁড়া তালি লাগান লেপটা মুড়ি দিয়ে বিছানার উপর বসে ফুরুৎ ফুরুৎ ক'রে গড়গড়ায় তামাক টানছিল আর মেয়ের উদ্দেশ্যে অকথ্য গাল দিচ্ছিল।

'শুয়ার কা বাচ্চি, মরিস নি তা হ'লে? আমি ভাবলাম বুঝি মরে গেছিস্!' লখা মেয়েকে দেখতে পেয়ে খেঁকিয়ে উঠল: 'একটু চা নেই, এক টুকরো রোটি নেই, খিদেয় ইদিকে আমার জান বেরিয়ে গেল! চায়ের জল চাপিয়ে দে···আর শুয়োরের সে বাচ্চা দুটো গেল কোথায়? রখা আর রধা... ডেকে দে—'

লখা সর্দার পঙ্গু অথর্ব এমন এক তিরিক্ষি বদমেজাজী লোকের মত কট্‌মট ক'রে তাকাল যেন তার শরীরে দয়া মায়া থাকলেও নিজের ছেলেপিলেদের সে হামেশা

গাল-মন্দ করতে একটুকুও কসুর করে না। কেননা কি জানি, পাছে তাকে বৃদ্ধ অথর্ব ভেবে নিজের ছেলেরাও তাকে অনাদর উপেক্ষা করে, তার কর্তৃত্ব যদি ওরা না মানে।

সোহিনী বাপের কথায় তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল। হাঁড়িটা চাপিয়ে দিয়ে ও ভাইদের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ল:

'ভাই বখিয়া'—ও রে রখিয়া! বাপ তুদের ডাকচে রে।'

রখা ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠেই কখন কেটে পড়েছিল খেলতে। বোনের ডাক শুনে বখাই শুধু ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল।

মুখ আর ঘাড় বেয়ে টস্ টস্ ক'রে ঘাম ঝরছিল তার। নিঃশ্বাসও পড়ছিল জোরে জোরে। কেননা, ইতিমধ্যে বেচারাকে নতুন আর এক দফা সরকারী টাট্টিগুলো পরিষ্কার ক'রে আসতে হয়েছে। কালো চোখ দু'টো দিয়ে যেন আগুনের হল্কা ছুটছে। চ্যাপ্টা প্রকাণ্ড মুখখানা ক্লান্তি ও অবসাদে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। গলাটাও কাঠ হয়ে গেছে।

'আমার পাঁজরটা ভয়ানক কনকন করছে বুঝলি?' ছেলেকে দোরগোড়ায় দেখতে পেয়ে বুড়ো গোঙিয়ে উঠল: তুই যা, নাট-মন্দিরটা আর সদর রাস্তাটা ঝাড় দিয়ে আয় গে, আর রখাটাকে যেখানে পাস ডেকে দিস। শুয়োরটা এসে এখানকার টাট্টিগুলো যেন সাফ ক'রে দেয়।

'বাপজান্, মন্দিরের পণ্ডিত ঠাকুর আজ বল্লে কি জান? বললে: ওঁদের বাড়ির উঠানটা আমি যেন ঝাড়ু দিয়ে আসি।' সোহিনী বললে।

'যা বাপু যা, যা খুশি করগে, আমার মুণ্ডুটা আর খাস্‌নি!' লখা খেঁকিয়ে উঠল।

তোমার পাঁজরটা আজকে ভয়ানক ব্যাথা করছে বুঝি? বাপের বদ্-মেজাজের সুযোগ নিয়ে বখা টিপ্পনী কাটে: 'পাঁজরটায় একটু তেল মালিশ ক'রে দেব?'

'না, না—' বুড়ো বিরক্ত হ'য়ে বলল। ছেলের টিপ্পনীতে একটু লজ্জাও বোধহয় পেয়েছে। আসলে তার পাঁজর কিংবা দেহের কোথাও কন্‌কন্ করছিল না। বুড়ো বয়সে কাজের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ছোট ছেলে-পিলেদের মত অসুখের ভান করছিল মাত্র।

'না, না,—তুই যা, তুই যা নিজের কাজ করগে। আমি ভাল হ'য়ে উঠব—' ঠোঁট বাঁকিয়ে লখা বলল।

চা হ'য়ে গেল। সোহিনী মাটির দু'টো ভাঁড়ে চা ঢালল। বখা এসে একটি ভাঁড় তুলে দিল বাপের হাতে আর অপরটি তুলে নিয়ে তাতে একটা চুমুক দিল। সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব পুলক সর্বাঙ্গে তার খেলে গেল। গরম টাট্‌কা চায়ের সুমিষ্ট স্বাদ ওকে চাঙা ক'রে তুলল। গরম চায়ে জিভটা একটু পুড়েও গেল। বাপের মত গাল ফুলিয়ে চায়ে একটু ফুঁ দিলেই পারত ও। কিন্তু অমনটা তো করতে পারে না বখা। ব্রিটিশ সৈন্যদের ব্যারাকে টমিগুলোর কাছ থেকে ও তো এসব জিনিস কখনও শেখেনি। ওকে খুড়ো কতদিন না বলেছে, গোরাগুলো চায়ের সুঘ্রাণ যদি কোনদিন উপভোগ করতে জানত! ওরা কি আর জানে ফুঁ দিয়ে চা ঠাণ্ডা করতে! খানিকটা থুতু ছিটিয়ে চা জুড়নোর দিশী রীতি—খুড়ো আর বাপের যা স্বভাব—কোনদিন তা ও বরদাস্ত করতে পারে না। সাহেবগুলো যে ওভাবে চা খায় না তা অবশ্য বাবাকে অনেকদিন বলতে গিয়েছিল। কিন্তু খুড়োকে ও সম্মান করে। ও নিজে ইংরেজ টমিগুলোর চালচলন হাব-ভাব সব মেনে নিতে পারে, অনুকরণও করতে পারে। তাই বলে গুরুজনদের ওসব করবার জন্য জোর জবরদস্তি করবে ও কোন্ আক্কেলে? একখানা রুটি খেয়ে নিজের চা'টা ঢকঢক্ ক'রে গিলে নিয়ে বখা বেরিয়ে গেল। প্রকাণ্ড ঝাড়ুগাছটা আর বাপের রাস্তার ময়লা ফেলবার চাঙ্গারিটা কুড়িয়ে নিয়ে ও পা বাড়াল শহরের দিকে।

অচ্ছুৎদের সড়কের দিকে যে গলিটা গেছে বখা তা পিছনে ফেলে এল। দেখতে না দেখতে আজ গলিটা কখন ফুরিয়ে গেল। গলিটার শেষপ্রান্ত থেকে শুরু হয়েছে অচ্ছুৎদের বস্তির পিছন দিককার ফাঁকা মাঠটা। চারদিকে মাঠ-ভরা রোদ্। সূর্যদেব যেন মেতে উঠেছেন বহ্নি-উৎসবে। টাটকা বিশুদ্ধ বাতাসে বুকটাও ভরে নিলে। ওদের বিশ্রী ধোঁয়াটে পূতিগন্ধময় ঘিঞ্জি বস্তির কথা ওর মনে পড়ে। আর এখানকার খোলা মাঠ—চারদিকে ঝল্‌মল্ করছে সোনালী রোদ। কি বিরাট তফাৎই না এই দুই পৃথিবীর! রোদ পোয়াতে ভয়ানক ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হয় শুকনো খড়িওঠা হাজা আঙুলগুলো রোদে মেলে ধরতে—নীল শিরা-উপশিরায় উষ্ণ রক্তের বান ডাকাতে। সত্যিই ও রোদের দিকে হাত দুটো তুলে ধরল। মুখ তুলে তাকাল সূর্যের দিকে। চোখের পাতা দুটো অর্ধ নিমীলিত হয়ে এল। অসাড় দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে চনচন ক'রে খেলে গেল উষ্ণ প্রস্রবণের ফোয়ারা। সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল...ভারি আরাম বোধ করল চারদিকের এই বিপুল স্বাস্থ্যকর পরিবেশে। নিজেকে অনেকটা সুস্থ সবল বোধ করল বখা। আরও যাতে রোদ এসে লাগতে পারে তাই দু'হাত দিয়ে ও মুখখানা একবার মুছে নিল। তারপর ঝুড়ি আর ঝাড়ুগাছটা বগলদাবা ক'রে দু'হাতের তালু দুটো মুখখানার উপর নিল বুলিয়ে। দু'একবার রগড়াতেই চিবুকটা গরম হয়ে উঠল। ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে বখার। শীতের রবিবারগুলোতে ও একরকম উলঙ্গ হ'য়েই রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সরষের তেল মাখত সর্বাঙ্গে। ছেলেবেলাকার কথাটি মনে পড়তেই মুখ তুলে তাকাল সূর্যের দিকে। কড়া ঝাঁজালো রোদ, চোখ দুটো ধাঁধিয়ে গেল ক্ষণেকের জন্য। চারদিকে অন্ধকার দেখল, যেন হারিয়ে ফেলল নিজেকে। খালি সূর্য! আশে পাশে চারদিকে মনে হলো যেন অসংখ্য সূর্য কিলবিল ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অদ্ভুত এক পুলকের তরঙ্গ বয়ে গেল ওর সর্বাঙ্গে।

অপূর্ব জ্যোতির্ময় আলোকজ্জল পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে ও সামনে পা বাড়াতেই সহসা হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল একখণ্ড পাথরের উপর। বিড়বিড় ক'রে গাল দিলে পাথরটার উদ্দেশে। চারদিকে তাকাল চোখ তুলে। দেখে নিল, কেউ ওকে দেখে ফেলল কি না। হ্যাঁ, ওই যে ধুপীদের ছেলে রামচরণ, মুচির ছেলে ছোটা আর ভাই রখা খেলছে। তারা ওকে ঠিক দেখে ফেলেছে। তাদের সামনে আপন মনে বিড়বিড় ক'রে ওঠায় ওর ভয়ানক লজ্জা হলো। ওকে যে সবসময় এরা জ্বালিয়ে খায়। ওর স্থূল দেহের, ফিটফাট বেশভূষার, অনেকটা হাতির মত পা ফেলে থপ্ থপ্ ক'রে চলাফেরা করার জন্য এরা তো ওকে হামেসা ঠাট্টা মস্করা করেই থাকে। অকারণ ওকে দু'হাতে মুখ রগড়াতে কিংবা আপন মনে কথা বলতে দেখে থাকলে এরা কি এখন টিপ্পনী না কেটে ছাড়বে? বিশেষ ক'রে ও যে একটা কায়দা-দুরস্ত হাল-ফ্যাশানে আদ্মী, একথা কে না জানে? এই দুর্বলতার জন্য ওকে কতদিন ঠাট্টা উপহাস হজম করতে হয়েছে। রখাও অবশ্য একহাত নিতে ছাড়েনি। প্রতিশোধ ও-ও নিয়েছে বৈ কি। ভুরুপোড়া ধুপীদের ছেলেটাকে দেখিয়ে ও ভেঙচিয়ে বলে: 'সবসময় সাবান ঘষে ঘষে গায়ের চামড়টা শাদা করতে চাস্ কিনা, তাই তো তোর অমন দশা—' শুধু তাই নয়, রামচরণকে ক্ষেপানোর জন্য একটা কিছু হলেই হলো। সে যে গুলাবের ছেলে আর তার যে ফুট্ফুটে সুন্দরী বোন আছে এবং বেটে-খাটো হাড়গোড় বার করা তার দেহ, একটা কানা গাধার পিঠে চেপে সে যে নদীর ধারে ঘুরে বেড়ায়—এসব নিয়ে তাকে সহজেই ক্ষেপানো যায়। ও কিন্তু ছোটার পিছু নেয় না। সুশ্রী সুঠাম গড়ন তার। বস্তির মধ্যে অমন চালাক চতুর ছোক্‌রা ক'টা আছে? তেল কুচ্‌কুচে এক মাথা সুবিন্যস্ত চুল। পরনে খাকী প্যাণ্ট, পায়ে শাদা টেনিস সু। রীতিমত যাকে বলে আদর্শ 'ভদ্দর নোক'। ওকে দেখে রখার তো তাই মনে হয়। অমন লোকের প্রশংসায় ও পঞ্চমুখ। অনুকরণ করতেও ইচ্ছে হয়। ছোটার সঙ্গে তাই ওর

একটা মধুর বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল। ওরা পরস্পর ঠাট্টা তামাসা করলেও সবসময় সেটা হেসে-খেলে গড়িয়ে দিত।

'আয় না রে জামাই ভাই।' রামচরণ তার ভুরুহীন চোখ দু'ঠো কুঁচকে ডেকে উঠল।

'আমি তো তোদের জামাই হতে চাইছিই রে, কিন্তু আমল দিচ্ছিস্ কোথায়? কোথায়?' জবাব দিল বখা। ও যে রামচরণের বোনের প্রণয়াকাঙ্খী একথা তো সকলেই জানে। বখা তাই ধুপীছেলের টিপ্পনীটা হাল্কা ক'রে নিলে।

'আরে, তার যে আজ সাদি! তুই বড় দেরী ক'রে এলি রে।' রামচরণ জবাব দিল। ঠাট্টাটা বখা যে আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না এই ভেবে সে খানিকটা আত্মপ্রসাদও লাভ করল!

'ওঃ, তাই বুঝি আজ তুই অমন বাহারে কাপড়-চোপড় খুব পরেছিস্? তাই বল্! গায়ে তোর কি সুন্দর ওয়েস্টকোট রে! মখমলের ওপর সোনালী কাজটা একটু যা উঠে গেছে। ওটা ইস্ত্রি ক'রে নিস্‌নি কেন? ও! ওটা ঘড়ির চেন বুঝি! ঘড়ির চেন আমিও খুব পছন্দ করি, বুঝলি! হ্যাঁরে, চেনের সঙ্গে তোর ঘড়ি আছে তো? না, খালি লোক-দেখানো ফ্যাশান ক'রে ঘড়ি ছাড়া চেন ঝুলিয়েছিস্?'

রামচরণ দমে গেল। চোখ দুটো আরক্ত হয়ে উঠল। ছোটা চুপ্ চাপ্ বসে বসে দু'জনের কথার লড়াই শুনছিল আর হাসছিল। বখা তার গায়ের ছেঁড়া তালি লাগানো ওভারকোটের লম্বা হাতায় হাত দুটো পুরে হি হি ক'রে শীতে কাঁপছিল। পুরনো ওভারকোটটা সে দাদার কাছ থেকে পেয়েছিল। অচ্ছুৎদের অনেকেই রোদে বসে বসে তখন তাদের পরনের জামা ও পায়জামার ভাঁজ থেকে বেছে বেছে উকুন মারছে। তাদের দিকে কেউ অত নজর দেয় না। রোদে কুৎসিৎ হাত পা ছড়িয়ে বসা বা দাঁড়ানো অচ্ছুৎদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে এক ক্লান্ত অসহায় বিষণ্ণ দৃষ্টি।

দেখে মনে হয়, এরা যেন নিজেদের আত্মার পারিপার্শ্বিক হিমেল অন্ধকারময় বিশ্বলোকের জঠর থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়তে চায়। বেরিয়ে পড়তে চায় প্রাণময় উদ্দীপ্ত আলোকোদ্ভাসিত পৃথিবীতে। মুক্ত আকাশের নীচেও এদের ঘিঞ্জি স্যাঁতসোঁতে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছোট ছোট পায়রার খোপগুলি যেন দু'হাতে ওদের আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। তাই বুকে মাথা গুঁজে ম্লান বিষণ্ণ মুখে ওরা চুপ ক'রে থাকে। মুক্তির স্বাদ, স্বাধীনতার অনাবিল আনন্দ পেলেও ওরা বুঝি সইতে পারবে না। সৃষ্টিকর্তা বিধাতা ওদের পরস্পরকে অচ্ছেদ্য বন্ধনডোরে বাঁধতে যেন ভুলে গেছেন। তাই ওরা ছন্নছাড়া—প্রাণহীন, নির্লিপ্ত, আপন সত্তাহীন, ভবঘুরের দল। ওরা নিজেরাই নিজেদের কাছেও এক পরম বিস্ময়।

বখাকে দেখে স্বাগত জানায় তারা। বখার প্রত্যাশাও তো তাই। বৃটিশ সৈন্যদের ব্যারাক থেকে নতুন ধরনের হালচাল শিখে এসে ও যে আশেপাশের প্রতিবেশীদের বিশেষ আমল দিত না, তা নয়। তাদের সঙ্গে একসূত্রেই তো ওর চিন্তা, অনুভূতি, জীবন-ধারা সবই গাঁথা। তাই ভব্যতার আবরণ পাওয়া যায় না। এদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালে কয়েক মুহূর্তের জন্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে ও মিশে যায় এক আলোকপিয়াসী অজানা অচেনা খাপছাড়া মূক জনতার সঙ্গে। ভদ্রতার মুখোশ এখানে নেই, নেই সম্ভাষণের মুখরতা, এই বিপুল জনতার সঙ্গে একীভূত হওয়ার জন্য সেসবের প্রয়োজন নেই, যেমন নেই আলোকোদ্ভাসিত জগতের সুখী বাসিন্দাদের নিজেদের মধ্যে। কারণ, পৃথিবীর এই আস্তাকুঁড়দের এই মানবতার নিকৃষ্ট জীবদের সামনে রয়েছে শুধু নীরবতা, রূঢ় নিস্তব্ধতা, তাদের বাঁচার সংগ্রামের পথে এক হিমেল মৃত্যু-নীরবতা।

এদের সঙ্গে মিশলে সকাল বেলাকার পুরো রূপটাই বখার চোখে ধরা দেয়।

'কে, বখা? আরে তুই চললি কোথায়?' ছোটা শুধায়। ওর কালো চুকচুকে মুখের উপর একফালি রোদ এসে পড়েছিল। চোখ দুটি তার নাচছে খুশিতে।

'বাবার অসুখ, তাই ভাই শহরের রাস্তা-ঘাট আর নাট-মন্দিরটা ঝাড় দিয়ে আসি।'

বখা এবার ভাইয়ের দিকে ফিরে বলল :

'ও রখিয়া, সকাল বেলা তুই অমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস্ কেন? বাবার অসুখ, আমিও বেরিয়ে পড়েছি। টাট্টিখানার সব কাজ পড়ে আছে।'

রখা বেঁটে খাটো ছোট্ট ছেলে। মুখখানা একটু লম্বা। কালো। একটু তোতলা। মনে মনে দাদার কথায় একটু চটে গেল। তবু খেলা ফেলে সে ঘরের দিকে পা বাড়াল মুখখানা বেজার করে।

'আরে, যাসনে যাসনে তুই!' রামচরণ ওর পেছনে ডেকে উঠল ফাজলামো ক'রে : 'দাদা তোর "ভদ্দরনোক" হয়েছেন কি না তাই খালি ঝাড় দেবেন রাস্তা-ঘাট। আর তোকে দিয়ে পায়খানা আর রাজ্যের যত সব নোংরা কাজ করিয়ে নিতে চাইছে।'

'যা, বক্ বক্ করিসনে, ও আমার শালা রে—' হাসতে হাসতে বলে বখা। 'ওকে এখন যেতে দে, কাজটাজ করুক্ একটু, শিখুক।'

'আয়, চল খেলিগে,' ছোটা বলে। সঙ্গে সঙ্গে সার্টের পকেটে হাত গলিয়ে দিয়ে এক প্যাকেট্ "লাল লণ্ঠন" সিগারেট বার করে। সিগারেট ক'টা সে একবার গুনে বখার হাতে একটা দিয়ে বলে : আয় রে আয়, সবাই একসঙ্গে একটু খেলিগে।'

ব্যাণ্ড-বাজিয়ে ছোক্‌রা ক্লেটন আর ছুতোর মিস্ত্রীদের ছেলে গধু তখন মাঠের মাঝখানে এক গর্ত খুঁড়ে মারবল খেলছিল। আঙ্গুল দিয়ে সে ওদের দেখিয়ে দিলে।

'আয়রে,' ছোটা আগ্রহে ফেটে পড়ল : 'চল আমরা কিছু টাকা লুটে আসি।,

'না রে ভাই, আমাকে কাজে বেরুতেই হবে—' বখা জবাব দেয় ছোটার প্রস্তাবে সে আমল দিতে পারে না। 'বাবা দেখতে পেলে ভয়ানক রাগ করবেরে ভাই।'

'ভুলে যা না বুড়োটাকে, আয়—' ছোটা গোঁ ধরে।

'আরে আয় না', রামচরণও ডাকে।

ওরা সবাই চুপচাপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। বাপ মা যে কোনো সময় ওদের জন্যে হাঁকাহাঁকি সুরু ক'রে দিতে পারে। শত গালমন্দ মারধোর—কিছুতেই ওদের শিক্ষা হয় না। প্রত্যেক দিন সকাল বেলা এমনি পালিয়ে আসা চাই রোদ পোয়াতে। কিন্তু বখার কথা আলাদা। নির্দিষ্ট নিয়ম মাফিক ওকে চলতে হয়। সবরকমের খেলাধুলোয় ওর জুড়ি মেলা ভার। 'খুটি' খেলাতেও ও ওদের সবাইকে সহজে হারিয়ে দিতে পারে। কিন্তু খেলাধুলোই ওর জীবনের সব নয়। কর্তব্য কর্মই হলো সর্বাগ্রে। ও কাজের জন্য পা বাড়ায়।

'একটু দাঁড়া না,' ছোটা বলে: 'বড়বাবুর ছেলেরা আসছে দেখছি। আজকের হকি ম্যাচের কি হলো? ৩১-নম্বর পাঞ্জাবী ছোঁড়াগুলো যে আমাদের রীতিমত চ্যালেঞ্জ ক'রে গেছে।'

'বাবা আসতে দিলে আমি আসব'খন।' বখা ব'লে মুখ তুলে তাকাল। ধব-ধবে সাদা পোষাক পরা দুটো ছোট ছেলেকে আসতে দেখে হাত তুলে নমস্কার ক'রে সসম্মানে বলে: সেলাম বাবুজি!'

বড় ছেলেটার বয়স বছর দশেক হবে। রোগা হাড্ডিসার সাদাসিধে গোবেচারী গোছের দেখতে। নাকটা একটু খাদা। দু'পাশের চোয়াল দুটো বেশ পুরু। বখার দিকে তাকিয়ে সে একটু হাসল। ছোট ছেলেটার বয়স হবে প্রায় আট। মুখখানি অনেকটা ডিমের মত। চওড়া কপাল, নীচের পুরু ঠোঁটটা একটু ঝোলা। কালো চোখ দু'টিতে দুষ্টুমি ভরা। আর ছোট্ট চিবুকটিতে রয়েছে দৃঢ় সঙ্কল্পের চিহ্ন। বখার উপর সে একবার চোখ দু'টি বুলিয়ে নিল। চোখ দু'টি তার নেচে উঠল।

'আরে এসো এসো!' সম্ভাষণ জানাতে জানাতে রামচরণ আর ছোটা বুক চিতিয়ে এগিয়ে এল। বললে: 'আজকে হকি ম্যাচের কি হবে? ৩১-নম্বর পাঞ্জাবী ছোঁড়াদের সঙ্গে যে আজ খেলতে হবে আমাদের।'

'সে খেলব'খন বিকেলে!' ছোট ছেলেটা দাদার আঙুল ধরে দাঁড়িয়েছিল। একটা লাফ মেরে বিপুল আগ্রহে ফেটে পড়ল সে। ছেলেমানুষ, কতটুকুন বা বয়েস; ষ্টিকখানা পর্যন্ত এখনও ধরতে শেখেনি ভালো ক'রে, চোট লাগবার ভয়ে তাকে কেউ খেলতেও ডাকে না, সে কিনা যাবে ম্যাচ্ খেলতে!

'তা হোলে আপনাদের ষ্টিক ক'টা আমাদের একবার খেলতে দেবেন? ছেলেটার উৎসাহের সুযোগ নিয়ে শেয়ানা রামচরণ কথাটা পাড়ল। এদের কাছ থেকে এই ফাঁকে যদি একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেওয়া যায় মন্দ কি। অবশ্য সে জানত, এরা প্রতিশ্রুতি দেয়ার মত প্রতিশ্রুতি ভাঙতেও সময় নেয় না! তাকে হয়ত আগের অনেক বারের মতই নিরাশ হতে হবে। ইতিপূর্বে অনেকবারই বিকেলে খেলার মাঠে এসে এমনিধারা তাকে নিরাশ হতে হয়েছে।

বাপের দৌলতে বাবুর ছেলেদের সঙ্গে স্থানীয় সৈন্যদলের হকি টিম ক্যাপ্টেনের খানিকটা দরহরম ছিল। হকি ষ্টিকও ছিল বিস্তর। পাড়ার ছেলেরা বাবুদের ছেলেদের কাছ থেকে ষ্টিক্ চেয়ে নিয়ে প্রত্যেকদিন বিকেলে প্রাক্‌টিস ম্যাচ খেলত। ওসব ছেলেদের নিয়েই ৩৮-নম্বর 'ডোগরা একাদশ' গড়ে উঠেছিল। বাবুদের বড় ছেলেটির কাছ থেকে ষ্টিক চেয়ে ওরা কোনো দিনই নিরাশ হয়নি। ছোট লোকদের ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলো করতো বলে মার গঞ্জনাও তাকে কম হজম করতে হয় নি। সব সে নীরবে মাথা পেতে নিত। কিন্তু ছোট ভাইটার কথা আলাদা। তোয়াজ না করলে ষ্টিক হাতছাড়া করতে সে কিছুতেই রাজী হতো না।

'হ্যাঁরে জানিস, হাবিলদার চারৎ সিংএর কাছ থেকে চকচকে আনকোরা একখানা ষ্টিক আমি নিয়ে এসেছি। নতুন একটা বলও।' বলতে বলতে সে

হঠাৎ চোখমুখ কুচকে ফিরে দাঁড়াল দাদার দিকে। ওকে একটা কনুই-এর খোচা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল : 'এস ইস্কুলে যাবে না? দেরী হয়ে যাচ্ছে যে!' গলায় তার বিরক্তির ঝাঁজ।

ছেলেটার ছোট মুখখানা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। বখা তা লক্ষ্য করল। ইস্কুলে যাবার কি একান্ত আগ্রহ ছেলেটির! বখার মনে হয় লেখাপড়া শিখতে পারলে কি ভালোই না হতো! খবরের কাগজগুলো পড়া যায়। সাহেবদের সঙ্গে সমান তালে কথা কইতে পারা যায়। একখানা চিঠি এলে সেটা পড়িয়ে নেবার জন্য ছুটতে হয় না পত্র-লিখিয়ের বাড়ি বাড়ি। আর দক্ষিণা দিতে হবে না চিটি লিখিয়ে দেবার জন্য। কতদিন তার ইচ্ছে হয়েছে ওয়ারিশ শা-র হীর আর রাঞ্জা'[১] পড়বার। সে যখন বৃটিশ সৈন্যদের ব্যারাকে ছিল কতদিন না তার ইচ্ছে হয়েছে টমিগুলোর মত টিশ-মিশ, টিশ-মিশ ক'রে কথা কইতে।

'সাহেব হতে হ'লে ইস্কুলে যাওয়া চাই।'

বৃটিশ ব্যারাকে থাকতে ও যখন খুড়োর কাছে প্রথম কথাটা পেড়েছিল ওর খুড়ো ওকে ইস্কুলে যাবার জন্য বলেছিল। ইস্কুলে যাবার জন্য ও তখন ভয়ানক কান্নাকাটি করেছিল। ওর বাপ মুখ ঝামটা দিয়ে উঠেছিল সেদিন: 'ইস্কুল কলেজ কি আর ছোটলোক ধাঙড় মেথরের জন্য রে? ওসব হলো বাবুলোকদের।' ও তখন অবশ্য অতসব বোঝেনি। বৃটিশ ব্যারাকে গিয়ে বুঝতে পেরেছিল বাপ কেন নারাজ হয়েছিল ছেলেকে ইস্কুলে পাঠাতে। বুঝতে পেরেছিল, এখানকার কোন ইস্কুলেই ওদের মত ছোটলোকদের প্রবেশ অধিকার নেই। প্রবেশাধিকার নেই, কেননা, ইস্কুলের অপর ছাত্রদের বাপ-মারা তাদের ছেলেপিলেদের ছোটলোকের কলুষিত ছায়া মাড়াতে দিতে রাজী নয়। হুঁ, যত সব আজগুবি কথা তাদের। আচ্ছা হকি

১ পাঞ্জাবের এক বিখ্যাত প্রেম-গীতিকাব্য।—অনুবাদক।

খেলায় জাত-হিন্দুর ছোঁড়াগুলো তো কতবার ছুঁয়ে দেয় ওদের! ও বেশ জানে ইস্কুলে একসঙ্গে পড়বার ওদের কারোও এতটুকু আপত্তি নেই। কিন্তু আপত্তি সব শিক্ষকদের। অস্পৃশ্য, অচ্ছুৎদের বিদ্যা দান করতে তারা পরাঙ্মুখ। কি জানি কখন পড়াতে গিয়ে ছোটলোকগুলোর বই ছুঁয়ে ফেলবে। তা'হলেই বলে সর্বনাশ! জাত গেল, সর্বস্ব কলুষিত হয়ে গেল! মান্ধাতা আমলের ঐসব সেকেলে হিন্দু বুড়োগুলোই যতসব নষ্টের গোড়া। হ্যাঁ, ও ধাঙড়ই! কিন্তু সখ ক'রে ও কি আর ধাঙড় সেজেছে? ছ'বছরে পা দিতে না দিতেই টাট্টি সাফের কাজে মাথা গলাতে হয় একান্ত বাধ্য হয়ে। জাত পেশা। বাপ ঠাকুর্দার আমল থেকে সবাই ক'রে এসেছে। ও তো আর ব্যাতিক্রম নয়। তাই-ও-ও জাত ব্যবসাটা মাথা পেতে নিয়েছিল। কিন্তু প্রতিদিন ও মনে মনে স্বপ্নসৌধ গড়ে তোলে সাহেব হবার। পড়াশুনা করতে কতদিন না ওর প্রবল ইচ্ছা হয়েছে। টমিদের ব্যারাকের দিনগুলি ওর মনে, স্বপ্নের রং ধরিয়ে দিয়েছে। কাজকর্ম সেরে অবসর সময় কতদিন ও বসে বসে ভেবেছে পড়বে বলে। দিনকয়েক পরে সত্যি সত্যিই ও গিয়ে একখানা ইংরেজী প্রথম-পাঠ কিনেও এনেছে। কিন্তু একা নিজের চেষ্টায় আর কতদূর এগোনো যায়? ইংরেজী বর্ণমালার অ, আ, ক, খ-র পাতায় এসে হুমড়ি খেয়ে ওকে পড়তে হয়েছিল। চারদিকের ঝল্‌মল্ করা রোদে বাবুদের ছোট ছেলেটাকে পরম আগ্রহভরে দাদার হাত ধরে ইস্কুলের দিকে টেনে নিয়ে যেতে দেখে সহসা বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল বথার। বাবুদের ছেলে ওকে একটু পড়াবে কিনা ইচ্ছে হয় জিজ্ঞেস করতে। বড় ছেলেটিকে উদ্দেশ ক'রে ও জিজ্ঞেস করলে:

'বাবুজী, আপনি এখন কোন ক্লাশে উঠলেন?'

'পঞ্চম শ্রেণীতে।'

'আপনি নিশ্চয় পড়াতে পারেন?'

'তা পারি—' উত্তর দিল ছেলেটি।

'আচ্ছা, রোজ আমায় যদি একটু পড়ান, আপনার কি অসুবিধে হবে?' ছেলেটা একটু ইতস্তত: করছে দেখে বথা আবার বলে :

'পড়ানোর জন্য আমি অবশ্য কিছু দক্ষিণাও দেব আপনাকে।' বথার গলাটা শেষের দিকে ধরে এল আগ্রহের আবেগে।

বাবুদের ছেলেরা তেমন বিশেষ কিছু হাত-খরচা পেত না। ওদের বাপ-মা খরচ-খরচা করতেন বেশ বুঝে-সুজে। ছোটলোকের ছেলেদের মত যখন তখন বাজার থেকে যা-তা কিনে খাওয়াটা পছন্দ করতেন না তাঁরা। একটু কিপ্টেও বটে। বড় ছেলেটা তাই দু'এক পয়সা কারো কাছ থেকে পেলে সেটা জমিয়ে রাখত।

'বেশ আমি তোমাকে পড়াব। কিন্তু—'

টাকা পয়সার ব্যাপারটা একেবারে উৎকট হয়ে চোখে না পড়ে অথচ কথাটা পাকা ক'রে নেবার জন্য একটু ইতস্তত: ভাব দেখায় ছেলেটা। ব্যাপারটা বুঝতে পারল বথা, বললে :

'প্রত্যেকদিন পড়ানোর জন্য আমি আপনাকে চার পয়সা ক'রে দেব, দাদাবাবু।'

বাবুদের ছেলে এবার একটু কপট হাসি হাসল, অতটুকু ছেলের মুখে সে-হাসি বড়ই বিশ্রী ঠেকে। সম্মতি জানিয়ে বলে উঠল সে :

'আরে সে হবে'খন, একটুখানি পড়ানোর জন্য আবার পয়সা কেন!'

'আজ বিকেল থেকেই তাহ'লে পড়াচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। মাথা নাড়ল বাবুর ছেলে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরও খানিকক্ষণ গল্প করতে ইচ্ছে করছে তার বথার সঙ্গে যাতে সখ্যতার বাঁধন আরেকটু নিবিড় হয়। কিন্তু ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে কড়া তাড়া আসে। দাদা যে পয়সার জন্য কাঙালপনা করবে, ছোট ভাই তা সইতে পারছে না। তাই দাঁতমুখ খিচিয়ে উঠে দাদার আস্তিন ধরে হেঁচকা টান মেরে একরকম চেঁচিয়েই বলে :

'এস। দেখ তো সূয্যি কতদূর উঠে গেছে মাথার ওপর। ইস্কুলে দেরী ক'রে গেলে মার খাবে না?'

বখা কিন্তু ওর ওমন চটে ওঠার কারণটা ধরে ফেলল। ইস্কুলের দেরী হওয়াটাই সব নয়। পড়িয়ে দাদা দু'পয়সা লাভ করবে তা বুঝি ছোট ভাইটির সইছে না। ব্যাপারখানা বখা বুঝতে পেরে তাকে তোয়াজ করবার জন্যে বললে:

'ছোট দাদাবাবু, আপনিও আমায় একটু পড়ান না। রোজ আপনাকেও আমি এক পয়সা ক'রে দেব।'

বখা জানত না এতেই সব রাগ জল হয়ে যাবে। মাকে কিছু আর বলবে না। বখা জানতো মার কানে যদি কথাটা একবার ওঠে যে ছেলে ধাঙড়দের বেটাকে পড়াচ্ছে তাহ'লে তিনি রেগে আগুন হয়ে যাবেন। বেচারাকে হয়ত বাড়ি থেকে তাড়িয়েও দেবেন। তিনি যে ধর্মান্ধ হিন্দু মহিলা বখা তা জানতো।

চঞ্চল বালক! তোয়াজ বা ঘুষের কদর কতটুকু বোঝে? সে ইস্কুলে যাবার জন্যে সত্যি ব্যস্ত হয়ে উঠল। দাদার জামার প্রান্ত ধরে হিড়্ হিড়্ করে তাকে ঠেলে নিয়ে চলল।

বখা এদের পেছনে তাকিয়ে রইল। আজ বিকেল থেকেই সে পড়বার সুযোগ পাবে তা'হলে। কথাটা ভাবতেই মুখখানা তার উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। বুকখানা ফুলে ওঠে নবীন আশায়। যাবার জন্যে সেও পা বাড়ায়।

'ও বাবু মশায়, দাঁড়ান। আপনি—থুড়ি তুমি যে এখন মস্ত লোক হতে চললে হে।' রামচরণ ব্যঙ্গ ক'রে উঠল পেছন থেকে: 'আরে, তুমি যে দেখছি কথাই কও না আমাদের সঙ্গে।'

'তুই একটা পাগল!' একগাল হেসে বখা জবাব দিল: 'অনেক বেলা হয়ে গেছে, আমি যাই ভাই। নাটমন্দির আর মন্দিরের সামনেটা ঝাড় দিতে হবে এক্ষুণি।'

'বেশ, পাগল কিনা আজকের হকি খেলায় দেখিয়ে দেব।'

'তাই দেখাস।' বথা বল্‌লে। ঝুড়ি ও ঝাড়ু বগলদাবা ক'রে ও শহরের দিকে পা বাড়াল। আপন মনে গুন গুন ক'রে ওঠে। ইচ্ছে হয় পাখীর মত গান গেয়ে উঠতে।...

আর পাঁচজন পথচারীর মত রাস্তার মাঝখান দিয়েই ও চলছিল। পেছনে সহসা গরুর গাড়ীর ঘণ্টা 'তান্—নানা-নান্-তান্' শব্দে বেজে উঠতেই একলাফে ও উঠে এল পথের একপাশে। এক হাঁটু ধুলোর ভেতর থেকে পায়ের জুতো জোড়াটি পুনরুদ্ধার করতে করতে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থার তারিফ না ক'রে ও পারল না। খালি একরাশ ধূলো! বরাত ভালোই বলতে হবে বৈকি যে আর কিছু ঘটেনি। রাস্তায় দু'পাশের চাকার সুগভীর খাঁজ ধরে গরুর গাড়ীখানা এগিয়ে চলেছে একটানা আর্তনাদ করতে করতে। একরাশ ধুলো উড়ে এসে পড়ছে ওর নাকে মুখে চোখে। অপূর্ব এক আনন্দ অনুভব করে বথা।

শহরের ফটকের কাছে এসে গেল বথা। পাশেই কয়েকটা চেলাকাঠের দোকান। আর খানিকটা তফাতে শ্মশান ঘাট। শ্মশানে যারা মড়া পোড়াতে আসে তারা ঐ দোকানগুলো থেকে কাঠ কিনে নেয়। একটা খোলা খাটিয়ার ওপর মড়া নিয়ে একদল শবযাত্রী এক দোকানের কাছে এসে থামল। লাল কাপড়ে মৃতদেহটি ঢাকা। কাপড়খানায় অসংখ্য লাল রঙের তারার ছাপ। বথা মৃতদেহটির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। হঠাৎ ওর ভয়, হলো, শরীরটা ভয়ে ছমছম্ ক'রে উঠল। কেমন মনে হয় ও যেন দু'পায়ে বিষাক্ত এক সরীসৃপকে মাড়িয়ে গেছে। ভয়ে আঁতকে ওঠে বথা। একটু পরেই নিজেকে আশ্বাস দেয়: মা বলতো, 'পথে বেরিয়ে মড়া দেখাটা শুভলক্ষণ, দিনটা আজ আমার ভাল যাবে।'

সে এগিয়ে চলল। মুসলমান ফলওয়ালারা তাদের ছোট ছোট দোকানের

সামনে বসে আখ কেটে রাখছে স্তূপাকার ক'রে। পরনে তাদের নোংরা জামা-কাপড়। মাথা কামানো, কিন্তু মেহেদি রঙ্ লাগিয়েছে দাড়িতে। বখা তা'দের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল। পিছনে ফেলে চলল হিন্দু খাবারওয়ালাদের দোকানগুলো। থালায় থালায় নানারকম সুমিষ্ট খাবার সাজিয়ে রেখেছে তারা। বখা এসে দাঁড়াল এক পানের দোকানের সামনে। দোকানটার তিন দিকে ঝুলছে তিনখানা প্রকাণ্ড আয়না আর হিন্দু দেবদেবী ও সুন্দরী মেমসাহেবদের লিথোগ্রাফ্ পট। মাঝখানে নোংরা পাগড়ী বাঁধা জনৈক ছোক্‌রা বসে বসে পানে খয়ের আর চুণ মাখাচ্ছে। ডানদিকে তার থরে থরে 'লাল লণ্ঠন' আর 'কাঁচি' সিগারেটের বাক্স সাজানো আর বাঁ দিকে বিড়ির বাণ্ডিল।

আয়নাতে বখার মুখের প্রতিচ্ছায়া পড়েছিল। সলজ্জ চোখ তুলে ও একবার আয়নার দিকে তাকিয়ে সিগারেটের বাক্সগুলোর উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। দোকানীর সামনে এগিয়ে এসে হাত দু'টি জোড় ক'রে একান্ত বিনীত ভাবে জানতে চাইল এক প্যাকেট 'লাল লণ্ঠন' সিগারেট নিতে হ'লে কোথায় পয়সা রাখতে হবে। দোকানী পাশের কাঠের বাক্সের উপর একটা জায়গা দেখিয়ে দিলে। বখা ওখানে আনিটা রাখল। পানওয়ালা তার লোটা থেকে খানিকটা জল ঢেলে নিকেলের আনিটাকে ধুয়ে পবিত্র ক'রে তুলে নিল। তারপর বখার দিকে ছুঁড়ে দিল এক প্যাকেট 'লাল লণ্ঠন' সিগারেট। বখা যেন একটা হ্যাংলা কুকুর—কশাইয়ের দোকানের চারপাশে মাটি শুঁকে শুঁকে ঘুর ঘুর করছে দেখে দয়ালু কশাই একটা হাড় ছুঁড়ে দিল কুকুরটার মুখের কাছে।

বখা প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে চলল। প্যাকেটটা খুলে সিগারেট বার ক'রে নিল। তাই তো দেশলাই যে কেনা হয়নি। কিন্তু পানের দোকানে আবার ফিরে যেতে ইচ্ছে হল না। ও যে ধাঙড়দের বেটা তা লোকের কাছে যত কম পারা যায় জাহির করাই ভালো। ছোটলোক ধাঙড়দের ধূমপান করাই

বুঝি এক মহা অপরাধ। তবে ওদের পয়সা কিন্তু পবিত্র, ধুয়ে নিলেই হল। গরীব ওরা ; বড়লোকদের মতো ধূমপান করাও ওদের পক্ষে অশোভন, বেয়াদবি। তবু যে অভ্যেসটা ছাড়তে পারে না। কেউ না দেখলেই হল।

রাস্তার দু'পাশে খোলা জায়গায় নাপিতরা নিজেদের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে পথের উপরই মাদুর পেতে বসে গেছে। বধা দেখল এক মুসলমান নাপিত মাদুরের উপর বসে মস্ত একটা হুঁকোয় তামাক টানছে। তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বিনয়াবনত কণ্ঠে বললে বধা :

'মিঞাজী, আপনার কলকে থেকে আমায় একটু আগুন দেবেন ?'

'তোমার সিগারেটটা ধরিয়ে নিতে চাইছ ? বেশ তো, আগুনের কাছে মুখখানা এনে ধরিয়ে নাও।'

বধা কেমন যেন ঘাবড়ে গেল। এটা যেন বাড়াবাড়ি। হিন্দুদের কাছে মুসলমানরাও অস্পৃশ্য বটে কিন্তু কোনো মুসলমানের কাছে ও কোনোদিন এমন ব্যবহার তো পায়নি, এতখানি স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি জীবনে। তবু কলকের উপর ঝুঁকে পড়ে সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে লম্বা টান দেয় সিগারেটটায়। নাক দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে খানিকক্ষণ পায়চারি করে। বুকটা তার হাল্কা হয়ে হয়ে যায়। তৃপ্তির নিশ্বাস ঝরে পড়ে।

শহরের প্রকাণ্ড চার-মিনার ছাড়িয়ে প্রশস্ত রাজপথে এসে পড়ল বধা। চোখ দুটো ওর মেচে ওঠে নানান বর্ণচ্ছটায়। প্রায় মাসখানেক হতে চলেছে, এদিক পানে একবারও আসা হয়নি। টাট্টিখানার একটানা কাজ সেরে এক মুহূর্ত ও ফুরসৎ পায় না। চারদিকের বিচিত্র মুখর—জনতার ভিড়ে নিজেকে ও ছেড়ে দেয়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সারি সারি দোকান। নানান্ পণ্যদ্রব্যে বিপণী সাজিয়ে বসে আছে দোকানদারেরা। হরেক রকমের ক্রেতারা ভিড় ক'রে আছে চারদিকে।...বাজারে এসে গেল ও। এখানে ওখানে তাজা আর বাসি শাক-সব্জী, তরিতরকারি, চাল-ডাল ইত্যাদি বিভিন্ন দ্রব্যের সমাবেশ। খোলা নর্দমা, নানান্ ধরনের লোকজন, সুবেশা

মহিলাদের পরিচ্ছদের উৎকট আতর গন্ধ...সবকিছু মিলে সৃষ্টি হয়েছে কেমন এক গন্ধের। পেশোয়ারী ফলওয়ালা পাকা পাকা লাল, বেগুনি, হলুদে ফলের ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে চারদিকে রঙের বাহার খেলিয়ে। মাথায় তাদের নীল রেশমী পাগড়ী। গায়ে সোনালী কাজ করা মখমলের ওয়েস্টকোট। পরনে লম্বা চিলে আলখাল্লা আর পায়জামা। কসাইখানার মাংসের দোকানগুলোতে রক্ত-লাল তাজা মাংস সব ঝুলছে। আর মিষ্টির দোকানগুলো থেকে যেন ছড়িয়ে পড়েছে রামধনু রঙের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা।...

চারদিকে ব্যস্ততা। মুখর জনতার মাঝে বখা নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলে মুহূর্তের জন্য। হরেক রকমের বিচিত্র জনতার ওপর থেকে চোখ তুলে ও একবার তাকাল সুসজ্জিত দোকানগুলোর দিকে। চোখে ওর শিশুর মতো ঔৎসুক্য আর অনুসন্ধিৎসা। কাঠুরেদের কাঠ-চেরার দিকে অবাক হয়ে ও তাকিয়ে থাকে। পরক্ষণেই আবার খলিফাদের দোকানের সামনে গিয়ে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে সেলাই কলের দিকে।

'আশ্চর্য। সত্যিই, কি আশ্চর্য।' বিড় বিড় ক'রে বলে। বেনিয়া গণেশনাথের ওপর ওর নজর পড়ে একসময়। ওটা একটা রীতিমতো ছোট লোক। জিভের আল কি! ঘরে বস্তা বস্তা ময়দা, গুড়, শুকনো লঙ্কা, মটর আর গমের ছড়াছড়ি। তবু এক খাম্‌চা নুন আর একছিটে ঘি-এর জন্যে এখানে বসে আছে হা-পিত্যেশ হয়ে। বখা মুখটা অন্যদিকে সরিয়ে নিল। কেননা, সম্প্রতি তার বাপের সঙ্গে বেনিয়াটার একটা ঝগড়া হয়ে গেছে। স্ত্রীর শবদাহের খরচ জোগাড়ের জন্য লখা বউ-এর কিছু অলঙ্কার বাঁধা রেখে গোটাকয়েক টাকা ধার নিয়েছিল গণেশের কাছ থেকে। ঝগড়াটা বেধেছিল সেই টাকার সুদের হার নিয়ে। সে এক বিশ্রী কাণ্ড। দৃশ্য মনে পড়তেই বখার মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। কোনোরকমে আত্মসংবরণ ক'রে ও তাকাল সামনের কাপড়ের দোকানের দিকে, মস্ত ভুঁড়িওয়ালা এক লালা একটা খেরো খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে আপন মনে হিজিবিজি কিসব লিখে চলেছে।

গায়ে তার সাদা ধবধবে মস্‌লিনের পিরান, পরনে ফিন্‌ফিনে ধুতি। গ্রাম থেকে এক বুড়ো তার বুড়িকে নিয়ে সওদা করতে এসেছিল সেই দোকানে। গাঁটের পর গাঁট বিলিতি ম্যানচেস্টার কাপড় খুলে খুলে তাদের দেখাচ্ছে দোকানের কর্মচারীরা। বিলিতি কাপড়ের সস্তা প্রমাণ করিয়ে কাপড় কেনবার জন্যে প্রলুব্ধ ক'রে তুলছে গেঁয়ো লোকটাকে। দোকানের এক কোণে নানা ধরণের কাপড় সব ঝুলছে। বথার চোখ ওদিকে পড়ে রইল। অমন পশমের কাপড় দিয়েই সাহেবরা তো স্যুট্‌ তৈরি করে, আর ওই চাষা দুটোর সামনে ছড়ানো কাপড়টা দিয়ে বোধহয় তৈরি করে অন্তর্বাস। পশমী কাপড়টার কি বাহারে রঙ। নিশ্চয়ই খুব দামী। পাত্‌লুন বা স্যুটের জন্য ওই কাপড়টা কেনবার কথা ও মনে স্থান দেয় নি মুহূর্তের জন্যও, তবু পকেটে ও হাতখানা গলিয়ে দেয় একবার। দেখে কাপড়টা কিনে কিস্তিতে দাম শোধ করবার মতো টাকা আছে কিনা। ও হরি, পকেটে পয়সা আছে মাত্র একটা আধুলি। আজ যে আবার ইংরেজী পড়ানোর জন্য বাবুর ছেলেকে পয়সা দিতে হবে!

রাস্তা পেরিয়ে ও চলে এল অপর ফুটপাতে। সামনেই এই বাঙালীর মিষ্টির দোকান। নোংরা কাপড়-পরা মোটামত ময়রাটির সামনে রূপালী পাত বসানো একথালা বরফি। তাই দেখে বথার জিভে জল এসে গেল। 'এখনও আমার পকেটে কড়কড়ে আট আনা পয়সা রয়েছে—' বথা বলে আপন মনে: 'কিছু মিষ্টি কিনব নাকি? বাবা জানতে পারলে কিন্তু—' ও একটু ইতস্ততঃ করে। তারপর আপন মনে আবার বিড়বিড় ক'রে ওঠে: 'জানুক গে, ভারী তো একটা জীবন! ক'দিন বা বাঁচব—কালকে যে পটল তুলব না, কে বলতে পারে? যতদিন বেঁচে আছ বাবা আশা মিটিয়ে খেয়েপরে নাও!' দূরে এক কোণে দাঁড়িয়ে ও দোকানটার দিকে তাকাল। যাচাই ক'রে নিল কেনবার মতো সস্তা কোনো খাবার আছে কিনা। রসগোল্লা, গোলাবজাম, লাড্ডু প্রভৃতি ভালো ভালো খাবারের উপর লুব্ধ, লোলুপ দৃষ্টি ফেলল। খাবারগুলো টুলবুল করছে রসের মধ্যে, দাম নিশ্চয় বেয়াড়া গোছের কিছু একটা হবে। ওসব কি আর

তাদের জন্য ? ময়রারাও ধাঙড় বা গরীব লোকদের দেখলেই চড়া দাম হেঁকে বসে। দোকান অপবিত্র করার খতিয়ানটা স্থদে আসলে আদায় ক'রে নেবে। জিলিপির থালার উপর বখার চোখ পড়ল। সস্তা খাবার। এর আগেও সে বারকয়েক কিনেছে,—টাকা টাকা সের।

'চার আনার জিলিপি দাও তো দেখি', বখা এগিয়ে এসে চাপা গলায় বলল দোকানীকে। মাথাটা তার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। মিষ্টি কিনতে এসেছে ভাবতেই কেমন যেন তার লজ্জা হল।

ধাঙড়-বেটার পছন্দখানা দেখে মনে মনে হাসল ময়রা। বাজে সস্তা খাবার হল জিলিপি। পেটুক ছোটলোক ছাড়া চার আনার একগাদা জিলিপি আর কে কেনে! কিন্তু সে হল দোকানদার। ও-নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তার লাভ কি ? দাঁড়ি পাল্লাটা হাতে তুলে নিয়ে একপো জিলিপি তাড়াতাড়ি মেপে পুরনো ছেঁড়া এক টুকরো ইংরেজী খবরের কাগজে মুড়ে ছুঁড়ে দিল বখার দিকে। ক্রিকেট্ বল ধরার মত বখা ছু'হাতে ঠোঙ্গাটা লুফে নিল। এক ঘটি জল দিয়ে জায়গাটা ধুয়ে দেবার জন্য ময়রার কর্মচারী ওখানটায় দাঁড়িয়ে ছিল। বখা তার পায়ের কাছে নিকেলের সিকিটি রেখে খুশি মনে বেরিয়ে এল।

জিভ দিয়ে ওর জল ঝরছিল কাগজের ঠোঙাটা খুলে গরম একখানা জিলিপি মুখে পুরে দিল। মনটা ভরে গেল পরম তৃপ্তিতে। পুরিয়াটা ও আবার খুলল। একগাল জিলিপি মুখে পোরার সত্যিই কি আনন্দ! পুরো আস্বাদটা বেশ উপভোগ করা যায়। একগাল জিলিপি চিবুতে চিবুতে তুমি হেঁটে চল চারদিক দেখতে দেখতে।

রাস্তার ছু'পাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাইন্-বোর্ড। তাতে লেখা আছে বড় বড় হরফে ব্যবসাদার, ডাক্তার, আইনজীবীদের নাম আর তাদের খেতাবের বহর। সাইন-বোর্ডগুলো গড় গড় করে পড়ে যেতে পারলে কি আনন্দই না হত বখার! থাকুগে—বখা নিজেকে আশ্বাস দেয়। আজ বিকেল থেকেই তো ও ইংরেজী পড়তে শুরু করবে। হঠাৎ ওর চোখ পড়ে এক খোলা

জানালার দিকে। মুক্ত বাতায়নে বসেছিল একটি মেয়ে। বধার চোখ দু'টি পড়ে রইল মেয়েটির ওপর। সে হারিয়ে ফেলল নিজেকে।

'এই ছোটলোক, বেটা ঘাটের মড়া! পথ চেয়ে হাঁটতে পারিসনে!' বধা চমকে উঠল। কে যেন খেঁকিয়ে উঠল তার কানের কাছে: 'এই পথ দিয়ে তুই যে আস্‌ছিস্ তা জানিয়ে আসতে পারিস নি, বেজন্মা শুয়ারের বাচ্চা কোথাকার! এই যে আমায় ছুঁয়ে দিলি, আমায় এখন নাইতে হবে না? আজ সকালে সবেমাত্র 'নতুন ধুতি আর শার্টটা পরলাম, এখন যে সব অশুচি হয়ে গেল!'

বধার গলাটা শুকিয়ে গেল। স্থাণুর মতো নিঃশব্দে ও দাঁড়িয়ে রইল। সর্বাঙ্গ যেন অসাড়, অবশ হয়ে গেল। দুরু দুরু কাঁপছে বুকটা। ছোটলোক, হীন দাসত্বের গ্লানিতে পঙ্কিল ওদের জীবন। জীবনে এতটুকু মিষ্টি মোলায়েম কথা কোনোদিন ওরা শুনতে পায় না। একটানা রূঢ় ব্যবহারই পেয়ে এসেছে জীবনভোর। কিন্তু এমন ভাবে হঠাৎ অপ্রস্তুত জীবনে হয়নি কোনোদিন। উঁচুজাতের কাউকে দেখলেই সবসময় মুখে ওর এক বিনয়-হাস্যের হাসি খেলে যায়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। বরং তা আরও ছাপিয়ে উঠল। সামনের লোকটার দিকে মুখ তুলে ও আড়চোখে একবার তাকাল। লোকটার চোখ দু'টো দিয়ে যেন আগুনের ফুলকি ছুটছে।

'ওরে পথের কুকুর, শুয়োরের বাচ্চা কোথাকার—তুই যে আসছিস চিৎকার ক'রে আগে থেকে হু'শিয়ার ক'রে দিস নি কেন?' বধার মুখের দিকে তাকিয়ে সে রাগে ফেটে পড়ল: বেটা শালা, জানিস না, আমাকে তোর ছায়া পর্যন্ত ছু'তে নেই?'

বধা তাজ্জব বনে গেল। হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল। মুখে একটা কথাও জুটল না। ক্ষমা-ভিক্ষার উদ্দেশে হাত দু'টো আপনা আপনি কখন জোড়া হয়ে এল। হাত দু'টো কপালে ঠেকিয়ে নত হ'য়ে বিড় বিড় ক'রে কি যেন

বলল কিন্তু লোকটা তা কানে তুলল না। ঘটনার আকস্মিকতায় সেও ভয়ানক অভিভূত হয়ে পড়েছিল। সবটা গুছিয়ে নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে পুনরাবৃত্তি করবার মতো মনের অবস্থাও ছিল না! ওর মিনতি-ভরা নীরব বিনীত নিবেদনে লোকটা বুঝি তুষ্ট হল না।

'শালা শুয়ার কোথাকার, নোংরা কুত্তি কা বাচ্চা!' লোকটা রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল। মুখে কথাগুলো সব জড়িয়ে যেতে লাগল: 'অ-আ-মাকে··· গি-গি-গিয়ে এক্ষুণি··কা··কাপড় জামা সব...ধুয়ে নিতে হবে। ···কা-কাজে যাচ্ছিলাম···তুই শালা, আমার যত দেরি ক'রে দিলি।'

ব্যাপারখানা কি দেখবার জন্য একটা লোক পাশে এসে দাঁড়াল। পরনে তার সাদা ধব্‌ধবে কাপড় চোপড়। ধনী হিন্দু সওদাগর বলেই মনে হয়। ওকে দেখে ক্ষুব্ধ লোকটা সাপের মতো ফোঁস করে উঠল:

'দেখলেন—দেখলেন তো মশাই, বেটা কেমন ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল! এসব কুত্তির বাচ্চাগুলো যেন পথ চলে অন্ধের মত। নিজেদের আসার খবরটা জানিয়ে দিতে পারে না শুয়ারগুলো!'

হাত দু'টো জোড় ক'রে বখা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কপাল বেয়ে ওর টস্‌টস্ ক'রে ঘাম পড়ছে।

সঙ্ দেখবার জন্য জনকয়েক পথচারী এসে জড়ো হল ওখানটায়। দেখতে দেখতে চারদিক ভিড় জমে গেল। নানা টীকাটিপ্পনি কেটে তারা ক্ষুব্ধ বিচলিত লোকটাকে আরও উস্‌কাতে লাগল। ভারতবর্ষের রাস্তাঘাটে কনস্টেবলের লাল পাগড়ীর সাক্ষাৎ মেলে কালেভদ্রে। অসাধু ঘুষখোর বলে ওদের আবার বদনামও আছে। হবেই বা না কেন! রাজ্যের যতসব দাগী চোর জুয়োচোর পাঁড় বদমায়েস নিয়েই গড়ে তোলা হয় কনস্টেবল বাহিনী। যেন ঠিক চোর দিয়ে চোর ধরার নীতি। সুতরাং লোকজনকে হঠিয়ে দেবার জন্য কোন কনস্টেবলের টিকি দেখা গেল না। বেচারী বখা ইতিমধ্যেই আধমরা গোছের হয়ে পড়েছিল। চারদিকে ভিড় দেখে ওর

অবস্থা' আরও শোচনীয় হয়ে উঠল। বুকের স্পন্দন বুঝি থেমে গেল। দু হাতে জনতার ভিড় ঠেলে অকুস্থান থেকে দূরে—বহুদূরে ছুটে পালিয়ে যেতে ওর ইচ্ছে হল। কিন্তু পরক্ষণেই ও বুঝতে পারল, ওকে ঘিরে ধরেছে সবাই। পালাবার পথ নেই। ইচ্ছে করলে অবশ্য গায়ের জোরে ও পালিয়ে যেতে পারে। ঐ তো মোটা হোৎকা ভুঁড়িওয়ালা ব্যবসাদারটি—এক ধাক্কাতেই তাকে ও চিৎপটাং ক'রে ফেলতে পারে মাটিতে। কিন্তু তা করবার যে উপায় নেই! আছে নৈতিক বাধ্যবাধকতার সামাজিক নাগপাশ। ও জানে এদের গায়ে হাত দিলেই একসঙ্গে একাধিক লোককে অপবিত্র-কলুষিত করা হবে। ইতিমধ্যেই দুভোগের চরম অবস্থা। গালমন্দ তার কপালে কি কম জুটছে!

'আর বোলো না ভাই, দিন দিন দুনিয়ার হালচাল যা হচ্ছে! বেটা শুয়ার-গুলোর যেন উইপোকার মতো পাছায় ডানা গজিয়েছে!' ভিড়ের ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বেঁটে এক বুড়ো বলে উঠল: 'ও বেটারই এক জাতভাই আমার বাড়ীর পায়খানাটা একবার সাফ ক'রে দেয়। হারামজাদা এখন বলে কিনা, মাসে এক টাকায় তার পোষাচ্ছে না। দু'টাকা ক'রে দিতে হবে। শুধু কি তাই মশাই, রোজ রোজ বেটার খাবারও চাই।'

'শালা যেন লাটসাহেব—চলাফেরা করে যেন লাফ্‌টান্ট গর্ণর!' ক্ষুব্ধ লোকটা রাগে ঘোঁৎঘোঁৎ করতে লাগল: 'দেখছেন তো মশাই, দিনকাল সব কি হচ্ছে!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা' আর দেখছিনে—'আর এক বুড়ো ফোড়ন দিয়ে ওঠে: 'কলিযুগ, কলিযুগ মশাই, ঘোর কলি!'

ক্রুদ্ধ বিক্ষুব্ধ লোকটার গায়ের জ্বালা তখনও বুঝি মেটেনি। সে আবার চিৎকার ক'রে উঠল:

'গোটা রাস্তাটা যেন ওরই, শালা কুত্তার বাচ্চা কোথাকার!'

ভিড় দেখে গোটাকয়েক ছোকরা এসে জড়ো হয়েছিল। লোকের হাঁটু

গলিয়ে তারা এগিয়ে এল সামনে। ছড়া কেটে চিৎকার ক'রে বলে উঠল: 'ওরে কুত্তার বাচ্চা? তুই না সেদিন আমাদের ঠেঙিয়েছিলি? কেমন সাজা হয়েছে রে এখন?'

'শুনলেন, শুনলেন তো মশাই, আপনারা সবাই শুনলেন তো?' লোকটা আবার বলে উঠল: 'ও শালা দেখছি আচ্ছা বদমাশ! পাড়ার ছোট ছোট ছেলেপিলেদের ধরে পর্যন্ত ঠ্যাঙায়।'

বখা ঘাড় গুঁজে এককোণে দাঁড়িয়েছিল। ছোকরাগুলোর বানানো অভিযোগে নির্দোষ অন্তরাত্মাটি ওর বিদ্রোহী হয়ে উঠল। একান্ত আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মুখ তুলে ও ছোকরাগুলোকে শুধাল:

'আমি আপনাদের কখন মারলাম দাদাবাবু?'

'বেটার আস্পর্ধাটা দেখলেন তো আপনারা! স্বচক্ষে দেখলেন তো? ওদের মেরে এখন আবার মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে!' লোকটা আবার চিৎকার ক'রে উঠল।

'না লালাজী, আমি ওঁদের কক্ষণো মারিনি—মারিনি কক্ষণো।' বখা মিনতি-ভরা কণ্ঠে জানায়: 'সত্যি এখানে আমার ঘাট হয়েছে। হাঁক ছাড়তে ভুলে গিয়েছিলাম, লালাজী। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন আপনারা। মনে ছিল না লালাজী। আর অমনটি হবে না। আমায় ক্ষমা করুন। আর অমনটি হবে না! আমায় ক্ষমা করুন। আর কখনোই এমন ধারা করব না, বাবু মশায়!'

কিন্তু বখার কাকুতি মিনতি সমবেত জনতার বুকে একটুকু করুণার রেখাপাত করল না। লালাজীর হাতে ধাঙড়দের ছেলেটার একান্ত দুর্ভোগ তারা পরম কৌতূহলের সঙ্গে উপভোগ করতে লাগল। আর যারা ভিড়ের মধ্যে চুপ ক'রে ছিল, তাদের মনটা বিষিয়ে উঠল যারা এতক্ষণ সমানে গলা বাজিয়ে হাঁকাহাঁকি করছিল তাদের বিরুদ্ধে। নিজেরাও কিছু বলবার জন্য আঁকুপাঁকু করতে লাগল।

বখার দুঃখ দুর্দশার মহা-অমানিশার রাত্রি যেন আর কিছুতেই কাটতে চায় না। ওর সমস্ত অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে নম্র-নত দীনতায়। ওর পা দুটো কাঁপতে থাকে থর থর ক'রে। হাঁটুর খিলানটা এক্ষুণি বুঝি ভেঙ্গে পড়বে। অনুতাপে ওর বুকটা ছেয়ে গেল। উৎপীড়কদের সমঝিয়ে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু ওরা তাতে কান দিল না। সমানে চিৎকার ক'রে চলেছে তারা:

'যত সব দায়িত্বহীন অসাবধান বেটা!'

'কাজকর্ম সব কিচ্ছু করবে না, কুঁড়ের বাদশা সব!'

'শালাদের মেরে একেবারে দুনিয়া থেকে লোপাট করা উচিত হে।'

বখার ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। এক টাঙ্গাওয়ালা তার ঝরঝরে খড়খড়ে টাঙ্গা হাঁকিয়ে ঘটনাস্থলে এসে পড়ল। আর একটু হলে হয়তো একটা দুর্ঘটনাই ঘটে বসত। টাঙ্গাওয়ালা তার হাড্ডিসার ঘোড়ার লাগামটা দু'হাতে কষে চিৎকার ক'রে উঠলে: 'হট্ যাও, হট্ যাও!'

দেখতে না দেখতে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। যে যেখানে পারে গিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিল। লালার রাগ তখনও জল হয়নি। সে তার চার ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা শরীরখানা নিয়ে আগে যেখানটায় ছিল সেখানেই খাড়া দাঁড়িয়ে রইল। টাঙ্গাওয়ালাকে জোরে হাঁকিয়ে আসতে দেখেও নড়ল না এক পা।

'ও লালাজী - লালাজী, হুঁশিয়ার!' টাঙ্গাওয়ালা বাজখাই গলায় হেঁকে উঠল। লালা কটমট করে তাকাল তার দিকে। হাত তুলে ইঙ্গিত করল টাঙ্গা থামাতে।

'অমন করে চোখ রাঙ্গাবেন না, বাবু মশায়!' টাঙ্গাওয়ালা যেন কথাটা ছুঁড়ে মারল। সে তার গাড়ীখানা হাঁকিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে ক'রে লাগামটা টেনে ধরল সজোরে।

'শালা, আমাকে যখন ছুঁয়ে দিয়েছিস নাইতেই যখন হবে, শালা, তবে

দাঁড়া।' টাঙ্গাওয়ালা শুনতে পেল লালা বখাকে বকছে। 'অসাবধান হয়ে অন্ধের মতো পথ চলার মজাটা দেখিয়ে দিচ্ছি শুয়ারের বাচ্চা কোথাকার!' ঠাস্ ক'রে প্রচণ্ড একটা চড়ের শব্দ ভেসে এল টাঙ্গাওয়ালার কানে। বখার মাথার পাগড়ীটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কাগজের ঠোঙাশুদ্ধ জিলিপিগুলি হাত থেকে ছিট্‌কে প'ড়ে গেল ধুলোয়। ভীতিবিহ্বল চোখ দু'টি তুলে ও দাঁড়িয়ে রইল। পরক্ষণেই সর্বশরীর রাগে রি রি ক'রে উঠল। ও আর দাঁড়াল না হাত দুটো জোড় ক'রে। চোখ দুটো ওর ঝাপসা হয়ে এল। চিবুক বেয়ে টস্‌টস্ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। চোখ দু'টি প্রতিশোধের আগুনে দপ্ ক'রে জ্বলে উঠল। সমস্ত শরীরটা রাগে, ক্ষোভে, নিদারুণ অপমানে থর্‌থর্ ক'রে কেঁপে উঠল। মুহূর্তের মধ্যেই সব দীনতার বাঁধ ভেঙ্গে পড়বে যেন খান্ খান্ হয়ে। ও হয়তো আর আত্মসংবরণ করতে পারত না যদি না লোকটা ইতিমধ্যে সরে পড়ত। রাস্তায় লোকটার টিকিটিও আর দেখা গেল না।

'যেতে দে, যেতে দে, ভাই, কিছু যেন মনে করিসনে। মাথার পাগড়ীটা তুই বেঁধে নে।' টাঙ্গাওয়ালা বললে সান্ত্বনার সুরে। মুসলমান সে, গোঁড়া হিন্দুদের কাছে সেও তো অস্পৃশ্য। তাই নিজেও কিছুটা অচ্ছুৎদের ব্যথায় সমব্যথী।

হাতের ঝুড়ি আর ঝাড়ুগাছটা পাশে নামিয়ে রেখে বখা মাথার পাগড়ীটা কোনোরকমে নিল পেঁচিয়ে। তারপর চোখের জলটা মুছে ঝাড়ু আর ঝুড়িটা আবার কুড়িয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

'ঠিক শিক্ষা যদি তোর হয়ে থাকে তবে এবার থেকে চলবার সময় হাঁক দিয়েই যাবি, বুঝলি বেজন্মা কোথাকার!' পাশ থেকে এক দোকানী বলে উঠল। বখা চম্‌কে ওঠে। সবাই বুঝি হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। দোকানীর ভৎর্সনাটা নীরবে হজম ক'রে ও পা চালিয়ে চলে এল ও-স্থানটি ছেড়ে। কিছুদূরে এসেই চলার গতি ওর আপনা থেকেই মন্থর হয়ে আসে। নিজের অজ্ঞাতে কখন হেঁকে ওঠে :

'হৈ হৈ, হট্ যাও—হট্ যাও, ধাঙ্গড আসছে? হৈ হৈ, হট্ যাও, হট্ যাও ধাঙ্গড় আসছে! হৈ হৈ, ধাঙ্গড় আসছে।'

ব্যর্থ রাগ ও অপমানের বিষানলে ওর অন্তরটি ধূমায়িত হয়ে উঠতে থাকে। তুষের আগুনের মতো ভিতরটা জ্বলে। রাস্তার চরম দুর্ভোগের কথাটা মনে হতেই অন্তরের আগুন আবার দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে, কিন্তু সে তো পঙ্গু অথর্ব আক্রোশ মাত্র। অনুতাপে বুকটা ওর ছেয়ে যায়। আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটি মনের পর্দায় ভেসে ওঠে—ওই ঘটনার সব লোকগুলো ওর মনের দুয়ারে বারে বারে ঘা দেয়। ক্ষুব্ধ অস্পষ্ট কতকগুলো মুখের মধ্যে শুধু লালার ক্রোধকষায়িত মুখ ভেসে ওঠে। চোখ দু'টিতে আগুনের ভাটা, বর্তুলাকৃতি রোগা লোকটির গাল দু'টো ভাঙ্গা, পাতলা ঠোঁট জোড়া শুকনো। সকলের সামনে দাঁড়িয়ে সমানে হাত পা নেড়ে গালাগাল ক'রে চলেছে সব। পেছনে ওর অনেকগুলো মুখ ওকে ঘিরে ধরে গাল-মন্দ, ঠাট্টা বিদ্রূপ ক'রে চলেছে। আর ও ঘাড় গুঁজে হাত জোড়া এক ক'রে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে! অবাক, নিস্পন্দ, প্রচণ্ড এক আবেগ বন্যায় উদ্বেলিত হয়ে প্রশ্ন জাগে ওর মনে: 'কেন, কেন এই অপমান? অমন অবনত হয়ে থাকবারই বা আমার কি দরকার ছিল? আমি ও ব্যাটাকে ঘা কয়েক বসিয়েও দিতে পারতাম। সকাল বেলা শহরেই যখন এলাম, হাঁক ছেড়ে হু'শিয়ার ক'রে দিলাম না কেন রাস্তার লোকজনকে? নিজের কাজে মন থাকলে তো আর এটা হত না। রাস্তাটা ঝাঁট দিতে আরম্ভ করলেই তো পারতাম। জাত-হিন্দুরা যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে সেদিকেই বা আমার খেয়াল ছিল না কেন? কিন্তু ঐ লোকটা, আমায় চড় মারবে কেন।' বখা আবার ভাবে। 'আহা, অমন জিলিপি কটা আর খাওয়াই হল না। সবটা পড়ে গেল মাটিতে। আচ্ছা, মুখে আমার কি হয়েছিল? একবার একটা প্রতিবাদ করলাম না কেন? হাতে পায়ে ধরে মাপ চেয়ে নিয়ে অন্য দিকে চলে যেতে পারতাম!...উঃ, গালে কি চড়টাই না বসিয়ে দিলে! তারপরেই কুকুরের মতো ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে গেল!

ভীরু কোথাকার···আর সেই ছোক্‌রাটা কি ডাহা মিথ্যেটাই না বললে! মিথ্যেবাদী কোথাকার!' বথা বিড়বিড় ক'রে উঠল: 'শালাকে দেখিইনি কোনোদিন। সবাই বাগে পেয়ে আজ এক হাত নিল। ছেলেটা কিন্তু জানত যে সে মিথ্যে বলছে। আচ্ছা পরে একবার পেলে হয়। কত লোক মজা দেখতে ছুটে এল। কেউ একটি কথা পর্যন্ত বললে না আমার হয়ে। সবাই সমানে গালাগালি ক'রে গেল। নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর সব! গাল-মন্দ তো হামেশা লেগেই আছে আমাদের কপালে। 'সানট্রি'-ইন্‌সপেক্টর আর বড় সাহেব সেদিন বাবাকে কি গালটাই না দিলে। সব সময় তারা কেবল গাল-মন্দ করে। আমরা ধাঙ্গড়, গু-মুত তাদের সাফ করি, গু-মুত তারা ঘৃণা করে, তাই আমাদেরও ঘৃণা করে—তাই বুঝি! সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বাবুদের নোংরা ময়লা পরিষ্কার করি কিনা, তাই বুঝি তারা আমাদের ছোঁয় না। টাঙ্গাওয়ালাটার কিন্তু দয়া-মায়ার শরীর। ওর কথায় আমি তো প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম। কিন্তু তারা তো মুসলমান। তারা তবু আমাদের ছুঁতে ইতস্তত করে না। সাহেবরাও করে না। শুধু জাত-হিন্দুরা আর ধাঙ্গড় ছাড়া বাদ বাকি আর সব ছোটলোকেরাই মনে করে। ওদের কাছে আমি হলাম শুধু একটা ধাঙ্গড়! অচ্ছুৎ। মেথর! অস্পৃশ্য! অশুচি!

অমানিশার বুক চিরে সহসা যেন এক ঝলক বিদ্যুতের আলোক-বান খেলে গেল। ওর অন্তরের গোপন কন্দরটি পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সেই আলোকে। আপন সত্তা—আপনার পারিপার্শ্বিক বিশ্বলোক সম্পর্কে বথা আত্মসচেতন হয়ে উঠল। ও নিজের জীবনটাকে আগাগোড়া তলিয়ে দেখল। বুঝতে ওর আর বাকি রইল না টাট্টিখানাগুলো সাফ নেই বলে কেন লোক-গুলো অকারণ রোজ রোজ খিচ্‌ খিচ্‌ করতে থাকে, অচ্ছুৎ বস্তির অপর বাসিন্দারাও বা কেন ওদের দেখে সহসা নাক সিট্‌কিয়ে ওঠে। আজ সকালেই বা কেন জনতার হাতে অমন দুর্ভোগ পোহাতে হল। সহসা ওর

শিরদাঁড়া বেয়ে অনুভূতির এক তরঙ্গ বয়ে গেল। সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার ক'রে বলে উঠতে ইচ্ছে হল: 'আমি অচ্ছুৎ, আমি হলাম অচ্ছুৎ—অশুচি—অস্পৃশ্য!' আপন মনে ও বিড়বিড় ক'রে উঠল। ভয় হল, কি জানি যদি আবার ভুলে যায় কথাটা, আবার যদি অন্ধকারে হারিয়ে ফেলে নিজের প্রবুদ্ধ চেতনাকে...সহসা ওর যেন চমক ভাঙ্গল। সর্বনাশ! রাস্তা দিয়ে চলবার সময় হাঁক ছাড়তে যে ও ভুলে গেছে! পরক্ষণেই গলা ছেড়ে ও হেঁকে উঠল: 'হৈ হৈ, হট্ যাও, ধাঙ্গড় আসছে!' মুখে 'হট্ যাও, হট্ যাও, ধাঙ্গড় আসছে' চিৎকার করলেও অন্তরাত্মাটি কিন্তু তার অনুরণন তুলল: অচ্ছুৎ-অচ্ছুৎ—অস্পৃশ্য—অশুচি!' ও জানে না কখন তার চলার গতি দ্রুততালে বেড়ে গেছে। জোর কদমে হেঁটে চলেছে ফৌজের মতো। পায়ে ভারী সামরিক বুটের শব্দ হোতেই ও সম্বিৎ ফিরে পেল। চলার গতি কমিয়ে দিল।

হঠাৎ ওর মনে হয় রাস্তার লোকগুলো যেন তাকিয়ে আছে ওর দিকে হাঁ ক'রে। নিজের ওপর চোখ দুটো একবার বুলিয়ে নিল বখা তাই তো, মাথার পাগড়িটা যে কখন খসে পড়েছে কপালের উপর। পাগড়িটা আবার ঠিক ক'রে বেঁধে না নিলে নয়। কিন্তু রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পাগড়ি বাঁধে কি ক'রে?

বুকের মধ্যে তার এতক্ষণ প্রচণ্ড এক ঝড় বইছিল। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল। পাগড়ী বাঁধতে রাস্তার একপাশে এসে তার মনটা অনেকটা হাল্‌কা হয়ে এল। চারদিকে বিচিত্র ঝল্‌মল্ করা ব্যস্ত মুখর দৃশ্য···পাশেই বিপুল দেহের একটা বুড়ো ধর্মের ষাঁড়। ছোট ছোট সিং; গায়ে চিত্র বিচিত্র চিহ্ন। চোখ বুঁজে বুঁজে জাবর কাটছে আর মাঝে মাঝে বিশ্রী চোঁয়া ঢে'কুর তুলছে। কি বিশ্রী দুর্গন্ধ! বখা নাক সিটকাল। বুড়ো ষাঁড়টার গোবরে জায়গাটা নোংরা হয়ে রয়েছে। ও-জায়গাটা তো তাকেই পরিষ্কার করতে হবে ভাবতেই বখার গায়ে যেন জ্বর এল। ঠিক এমন সময়

বুড়ো মতো জনৈক জাত-হিন্দু এগিয়ে এল। পরনে সাদা ধব্‌ধবে ধুতি, বাঁ কাঁধে একখানা পাতলা মস্‌লিন চাদর। বড়লোক বলেই মনে হয়। দিবানিদ্রারত বৃষভ পুঙ্গবের বিপুল দেহে সে তার তর্জনীটা নিয়ে স্পর্শ করল। হিন্দুদের রেওয়াজ ঐ, এ কথা বখা জানত। ষাঁড় দেখলে স্পর্শ করতেই হবে। স্পর্শ কেন করতে হবে সেকথা অবশ্য জানেনা সে। শহরের পথে ঘাটে কতদিন বখা দেখেছে ধর্মের ওই ষাঁড়গুলো এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এসে উপস্থিত হল শাকসবজির দোকানগুলোর সামনে। শুঁকতে শুঁকতে এক সময় কখন একটা বাঁধাকপি অথবা কোনোদিন বা গাজর মুখে ক'রে পালাল। দোকানী হয়তো তখন তেড়ে এল, বৃষভ পুঙ্গব পেছনে হটে গিয়ে পরম নির্বিবাদে আত্মসাৎ করে সেই শাকসবজিগুলো। দোকানীর তর্জনগর্জনে ভ্রূক্ষেপও করে না। দোকানীর অন্যমনস্কতার সুযোগ পেলেই আবার নতুন দফা আক্রমণ করতে কসুর করে না।

'আচ্ছা, এ কেমন ধরনের কথা, হিন্দুরা তাদের গরুগুলোকে কি খাওয়াতে পারে না? এ দিকে তো 'মা' 'মা' বলে ডাকে ভক্তি-ছেদ্দার বাহার দেখিয়ে। পরম দেবতা গরুগুলোর চেহারা কি একএকটা। হাড্ডিচর্মসার শরীর। নদীর ধারে চরতে এসে ঘাস ছিঁড়ে খেতে পর্যন্ত পারে না। এমনি সব রোগা। দিনে দু' সেরের বেশী দুধও কোনোটা দেয় না।'...তার মনে পড়ে এক ধনী হিন্দু সওদাগর তার বাবাকে একবার একটা মোষ দান করেছিল। কোনো কিছু সংস্কারের বশবর্তী হয়েই বেনিয়া দিয়েছিল মোষটি। ধনী সওদাগরটির অনেক দিন থেকে ছেলেপিলে হচ্ছিল না। গুরুদেব তাকে বলেছিল ধাঙ্গড়দের গো-দান করতে।...দানের মোষটাকে রোজ দু'বেলা ও পেট ভরে দানা-ভূষি খাওয়াত। মোষটা শেষকালে দিন বারো সের ক'রে দুধ দিত। আর এরা নিজেদের গরু-বাছুরের সামনে একমুঠো ভূষি পর্যন্ত ছিটিয়ে দেয় না। বড় জোর দেয় খানিকটা ভাতের ফেন। তবুও তো গরু-বাছুরের প্রতি ভক্তি-ছেদ্দা কিছু আছে এদের। কিন্তু ষাঁড়—পরের পেঁয়াজ-ক্ষেতের দিকে

ছোটা ছাড়া উপায় কোথায়? মুখে কি পেঁয়াজের গন্ধ রে! আজও নিশ্চয় ঢুকেছিল পেঁয়াজ-ক্ষেতে।

বখা এতক্ষণ আপনার গণ্ডিতেই আবদ্ধ ছিল। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কথা ও এক রকম ভুলেই গিয়েছিল। শালগম আর গাজর-ভর্তি এক গরুর গাড়ী ওখানটায় এনে ঢেলে দেওয়া হল। বখা তাড়াতাড়ি কয়েক পা পিছু হঠে না এলে ঝুড়ি ভর্তি পচা দুর্গন্ধ শাক-সবজির পাহাড়ের নিচে ও চাপাই পড়ত। পচা পূতিগন্ধ শালগম আর গাজরের ঝুড়ির দিকে ও হাঁ ক'রে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। কি বিরাট অপচয়! বোঁটকা গন্ধটা নাকে আসতেই বখা পা চালিয়ে সরে এল ওখান থেকে! বাজারের ভিড় আর গরমে সে রীতিমতো ঘেমে নেয়ে উঠেছে। ওর সহজ সরল প্রশস্ত মুখাবয়বে যে প্রশান্ত মানবতাবোধের ছাপ দেখা যেত, সামান্য পরিবর্তনে ওর চোয়ালের উঁচু হাড়ে ভেসে উঠত তারই প্রতিফলন, সেই ঈষৎ স্ফীত নাসিকা, আরবীয় ঘোড়ার মতো যার নাসারন্ধ্র ফুলে ফুলে ওঠে, পাতলা পরিপূর্ণ মৃদু কম্পমান ঠোঁট জোড়া যে সব সময় প্রচণ্ড মনে হত, এখন এই মুহূর্তে ম্রিয়মাণ, গম্ভীর, উদাসীন হয়ে উঠেছে।

'হৈ-হৈ হট যাও—হট যাও, ধাঙ্গড় আসছে!

বখা আবার হাঁটতে সুরু করে।—জনাকীর্ণ প্রশস্ত রাজপথ ছেড়ে দিয়ে এক সংকীর্ণ গলি ধরে ও হাঁটতে শুরু করে। সড়কটার এখানে ওখানে গোটাকয়েক স্থানীয় ব্যাণ্ড-বাজিয়েদের দোকান। অবসরপ্রাপ্ত কোনো কোনো সামরিক ব্যাণ্ড-মাস্টারের নেতৃত্বে এরা খিলিতি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে থাকে। বিয়ে-সাদিতে কিংবা ছেলেপিলের জন্মোৎসব উপলক্ষে এরা ব্যাণ্ড বাজায়। চাহিদাও খুব। একটা মুদির দোকানও আছে: আর মোড়ে রয়েছে এক পানের দোকান। ময়দার কলও আছে। বুড়ীরা সব মোটা আটার জন্য এসব কলে ছোটে। দোকানের ময়দা তারা নাকি হজম করতে পারে না। খরচ কমানোর জন্য পাইকারী দরে গম কিনে ভাঙ্গিয়ে

আনবার জন্যও কেউ কেউ এখানে ছোটে। রাস্তাটার এক কোণে পুরনো ধরনের একটা তেলের ঘানিও রয়েছে। একটা প্রকাণ্ড অন্ধকার ঘরের মধ্যে চোখ-বাঁধা কলুর বলদগুলো একটানা ঘুরে ঘুরে ঘানি টানছে। ছোট বেলা থেকেই বখা এই পথ দিয়ে যাওয়া আসা করছে। এই পরিবেশটা ওর ভাল লাগত। বিলিতী বাদ্যযন্ত্রগুলো—বিশেষ ক'রে জাহাঙ্গীরের ব্যাণ্ডের দোকানে সাজানো সোনালী কাজ-করা পোষাক-পরিচ্ছদগুলো ওর ইংরেজ-অনুকরণপ্রিয় মনকে বিশেষ ক'রে নাড়া দিত। জাহাঙ্গীরই ছিল শহরের সেরা ব্যাণ্ড-বাজিয়ে দোকানের :মালিক। পথটা নিরিবিলি। সেই হট্টগোল নেই এখানে। আর যে কটা দোকান আছে পথচারীকে তারা প্রলুব্ধ করে না।

বখা সহসা গম্ভীর হ'য়ে ওঠে। জাহাঙ্গীরের দোকানে বিলিতী বাদ্যযন্ত্র-গুলো আর সোনালী কাজ করা পোষাকগুলো দেখে ওর ৩৮ নম্বর ডোগরা সামরিক ব্যাণ্ড-বাজিয়েদের কথা মনে পড়ে যায়। ডোগরা সৈন্যগুলো প্রায় প্রত্যেকদিন ব্যাণ্ড বাজিয়ে কুচ্‌কাওয়াজ করতে যেত। পুরনো স্মৃতিটা মনে পড়তেই বখার বুকটা জুড়িয়ে গেল। মান-অভিমান—সকালবেলাকার সব অপমান-দুর্ভোগের কথা নিঃশেষে কখন মুছে গেল ওর মন থেকে।

মোড়ের বাড়িটাকে বাঁয়ে রেখে নির্জন রাস্তা ছেড়ে ও এগিয়ে চলল। সামনে কয়েক সার সস্তা অলঙ্কারের দোকান। নিকেলের উপর চক্‌চকে রূপালী ইলেকট্রোপ্লেট কাজ করা হয় এই দোকানগুলোতে। ছোট বয়সে বখা মার মতো রূপোর অলঙ্কার পরবার জন্য আবদার করতো। বায়না ধরতো হাতের আংটি কিনে দিতে। কিন্তু বড় হ'য়ে বৃটিশ ব্যারাকে গিয়ে ও দেখেছে সাহেবরা অলঙ্কার পরতে ভালবাসে না। ওর মনটিও তাই সূক্ষ্ম কাজ করা দিশি অলঙ্কারগুলোর প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে। অলঙ্কারের দোকানের নীল কাগজের উপর ঝুলিয়ে রাখা বড় বড় কানপাশা, নাকছাবি ও সোনালী কাজকরা চুলের কাঁটাগুলোর দিকে বখা চোখ তুলেও তাকাল না। একটা

বাক্সের উপর নানান রকমের ছিট কাপড় সাজিয়ে এক মুসলমান ফেরিওয়ালা সাদা থান পরা জনকয়েক হিন্দু বিধবার সঙ্গে দরাদরি করছে পথের মাঝেই দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে ওরা পথ ছেড়ে দেয় কিনা দেখবার জন্য মিনিটকয়েক অপেক্ষা করল বখা। হাঁপিয়ে পড়েছিল ও। হাঁক ছাড়তে আর ইচ্ছে হচ্ছিল না। পাশে এক পাঞ্জাবী শিখের ছবি-বাঁধানোর দেকোন। দোকানদার জার্মানীর ছাপা সস্তা হিন্দু দেব-দেবীর ছবির উপর কাচের ফ্রেম বাঁধছে। দোকানের দেওয়ালে প্রায় বিবসনা এক ইংরেজ মেয়ের ছবি ঝুলছে। হাতে তার একটি ফুল। বখার চোখ দু'টো তার উপরই পড়ে রইল। ভুলে গেল ঠাকুর দেবতার ফটোর কথা। শিখটা বখার হাতের ঝুড়ি ও ঝাড়ুগাছটার দিকে কট্‌মট্‌ ক'রে তাকিয়ে খেঁকিয়ে বলে ওখান থেকে সরে যেতে। বখা চমকে উঠে তাকায় দোকানীর দিকে, তারপর বখা হেঁকে ওঠে: 'হৈ হৈ, হট্‌ যাও, হট্‌ যাও, ধাঙ্গড় আসছে। মুসলমান ফেরিওয়ালাটি তখনও তার সেই খদ্দেরগুলোর সঙ্গে দর-দস্তুর নিয়ে ব্যস্ত। কাপড়টা তাদের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারলেই যেন দোকানী বর্তে যায়। অচ্ছুৎ যে আসছে সেকথাটাও দোকানী জানাবার ফুরসত পেল না। থান-পরা বিধবাদের কাছ থেকে সে এক সময় ছিট কাপড়টা ছিনিয়ে নিল। বখার সামনে দিয়ে ওরা ফিস্‌ফাস্‌, নানান্‌ চিৎকার করতে করতে চলল। তারপর গিয়ে জড়ো হলো ওরা বালা ও মলের দোকানগুলোর সামনে। বেনারসী শাড়ী ও সোনালী কাজ করা সিল্কের জামা পরে নতুন কনে-বৌরা মা বা শাশুড়ীর পিছু পিছু ভীরু সলজ্জ পা ফেলে মন্দিরের দিকে চলেছে। মল বিক্রেতারা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ঘণ্টা বাজাচ্ছে। বখা চলেছে মন্দিরের দিকে। ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে আবার হাঁক ছাড়লে: 'হৈ হৈ—হৈ হৈ, হট্‌ যাও—হট্‌ যাও, ধাঙ্গড় আসছে।' কিন্তু সরবে কে? নীল পয়োধরা মেয়েরা তখন কথায় মত্ত। অবশেষে বখাকে আরও গলা চড়াতে হলো, তবে ওর এগোবার পথ পরিষ্কার হলো।

সামনেই এক বিশাল দেবালয় নানা সূক্ষ্ম কারু-কাজ-করা তার বিপুল গম্বুজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে। চোখ তুলে তাকালে মনটা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যায় একটা ভয়াল বিস্ময়ে। ছোটবেলা থেকেই দশ হস্ত, দ্বাদশ মস্তক নানান দেবদেবী দেখলেই বখার সর্বাঙ্গ ছম্‌ছম্ ক'রে ওঠে। মাথা নুয়ে পড়ে শ্রদ্ধা আর ভক্তি ভয়ে। উঁচু দেয়ালের ছায়া পড়ছে উঠানে। সেই ছায়াঘন প্রাঙ্গণ পেরিয়ে যেতে যেতে কেমন যেন মনে হয় কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির উপস্থিতি, সমস্ত বাতাস যেন কেমন ভারী ভারী মনে হয়। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। প্রকাণ্ড মন্দিরটার কার্নিসে গুটিকয়েক মেঘ-রঙা পায়রা উড়ে এসে বসল। পাতলা নীল রঙের পায়রাগুলোকে দেখে আর তাদের বক-বকম শুনতে শুনতে বখার মনের সব উত্তাপ মুছে গেল। নাট-মন্দিরের এখানে ওখানে ফুল, বেলপাতা আর চাপ চাপ ধুলো জমে উঠেছে। জঞ্জালটা আগে কিন্তু পরিষ্কার করতে হবে।

ঝুড়ি ও ঝাড়ুগাছটা ও মাটিতে নামিয়ে রাখল। ঝাকড়া মাথা একটা বিরাট বটগাছ মন্দির-প্রাঙ্গণের উপর ঘন ডালপালা বিস্তার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। বখা তার নীচে এসে কোমরের কাপড়টা কষে বেঁধে নিলে। কাজে এবার লাগতে হবে। বটগাছটার প্রকাণ্ড গুঁড়ির এক জায়গায় পাথরের একটা ছোট মতো বেদীর উপর একটা ছোট্ট মন্দির। সেই মন্দিরের অভ্যন্তরে পিতলের সিংহাসনের উপর দণ্ডায়মান মসৃণ পাথরের এক সর্প মূর্তি। বখার দৃষ্টি মূর্তির উপর গিয়ে পড়ল।

'আচ্ছা, সাপের মূর্তি কেন?' বখা ভাবে নিজের মনে: 'গাছের গোড়ায় কোনখানে হয়তো সাপ একটা থাকে।' কেমন ভয় হয় ওর মনে। দেখে: বটগাছের নীচে ছোট্ট মন্দিরের বেদীতে একবার মাথা ঠুকে দলে দলে ভক্ত নরনারীরা ফিরছে মন্দির-অঙ্গনের উপর দিয়ে। এদের দেখে মনে অনেকটা সাহস ফিরে পেল বখা। তারপর যেখানটায় ঝুড়ি ও ঝাড়ুগাছটা ফেলে এসেছিল, এগিয়ে গেল সেদিকে। চিৎকার ক'রে জানান দিল তার আগমন-

বার্তা। সকাল বেলাকার সকরুণ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে আর না ঘটে আগে থেকে হুঁসিয়ার হওয়াই ভাল। কেননা এখানকার লোকজনগুলো আবার বেজায় গোঁড়া। উঁচু বড় বড় সিঁড়ির ধাপগুলো পেরিয়ে দরজা দিয়ে ওরা মন্দিরের মধ্যে একবার যাচ্ছে, আর একবার বেরুচ্ছে। ঘুর ঘুর ক'রে বেড়াচ্ছে—নীল, সাদা, লাল, সবুজ রঙের নানান বাহার ছড়িয়ে। বখা আড়চোখে তাদের দিকে তাকায়। মনে ওর প্রশ্ন জাগে: 'লোকগুলো কি সত্যি পূজো দিতে এসেছে এখানে?'

'রাম,—রাম,—শ্রীহরি—নারায়ণ—শ্রীকৃষ্ণ!' সহসা এক ভক্ত গদগদ কণ্ঠে বলে উঠল বখার পাশ দিয়ে যেতে যেতে: 'হে বীর হনুমান—কালী মায়ী!'

'রাম' নাম অনেক বার ও শুনেছে। 'শ্রী-শ্রী'ও। দেওয়ালে বানরের মূর্তি আঁকা লাল একটা মন্দিরও ওর চোখে পড়েছে। মন্দিরটা হনুমানজীর ও জানত।

কালী মন্দিরের কথায় তার মনে পড়ে নিকষ মিশমিশে কালো এক নারী মূর্তি—লক্‌লকে রুধিরাক্ত জিহ্বা, চারখানা হাত, গলায় নরমুণ্ডের মালা। আর কৃষ্ণ ঠাকুরের মূর্তি হোল নীল বর্ণের। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাচ্ছেন। রাস্তার পানের দোকানে কৃষ্ণ ঠাকুরের কত রঙীন ছবি তো ও দেখেছে। কিন্তু হরিনারায়ণটি কে? 'ওঁম্ ওঁম্ শান্তিদেব—শান্তিদেব!' আওড়াতে আওড়াতে এক ভক্ত গেল তার পাশ দিয়ে। বখার চোখ দু'টি ছাপিয়ে ওঠে অবাক বিস্ময়ে: 'শান্তিদেব আবার কোন ঠাকুর এল? মন্দিরে তাঁর মূর্তি কই?'

'না, এখানে দাঁড়িয়ে কিছু দেখবার জো নেই।' বিড়বিড় ক'রে উঠল বখা: 'আমি ওখানটায় গিয়ে দেখব।' কিন্তু একলা সাহস হয় না। সব শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছে ও। ও জানতো অচ্ছুৎরা মন্দিরে ঢুকলে মন্দির অপবিত্র হয়। হাজার ধোয়া-মোছাতেও বলে সে শুচিতা আর ফিরে

আসবে না! সকাল বেলা কোনো কাজ করেনি জানতে পারলে তার বাপও হয়ত রাগ করবে। তাকে এখানটায় কেউ ঘোরাফেরা করতে দেখলেও তো বিপদ। চোরও বলতে পারে।

'ধ্যাৎ কপালে যা থাকে থাকুক, একবরে গিয়ে দেখে আসতে হবে!- বখা ওর মনের অনুশাসনের কড়া নিষেধ সরিয়ে দেয়। মাথায় রোখ চাপল। ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকিয়ে নিয়ে সাহসে বুক বেঁধে ও পা চালাল মন্দিরের সিঁড়ির দিকে। যেন নেশা করেছে ও। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ ক'রে উঠল। পা দু'টো কেমন অসাড় আড়ষ্ট হয়ে গেল। শত সহস্র বৎসরের অভ্যেস আর সংস্কারের মোহজাল ওর টুঁটিটা যেন চেপে ধরেছে। নির্যাতিত নিপীড়িত অভিশপ্ত জীবন। পদদলিত কুকুরের মত অবনত এক ইতর ঘরে ওর জন্ম। মাথা নত ক'রে চলাই অভ্যেস। সবটাতেই কেমন ভয়-ভয় ভাব। প্রতি পদে পদে দ্বিধা-সঙ্কোচের বেড়াজাল। দু'এক ধাপ উঠেই ও থমকে দাঁড়াল। বুকের স্পন্দন যেন থেমে গেল ওর। যেন হারিয়ে ফেলেছে চলনশক্তি। আবার ফিরে গেল ও ওর পূর্বস্থানে। কাঠের হাতলওয়ালা ঝাড়ুখানা তুলে নিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণ ঝাঁট দিতে লাগল। সামনে উঠল একরাশ ধুলোর ঝড়। সূর্যকিরণে সোনার মত চক্ চক্ ক'রে উঠেছে ধুলোকণাগুলো। কিন্তু তা বখার নজরে পড়ল না, ঘাড় গুঁজে ও বটগাছের শুক্‌নো পাতা, ইতস্তত: ছড়ানো ফুলের পাপড়ি, পায়রার নোংরা ময়লা, খড়কুটো ধুলো--ঝাড়ু দিয়ে স্তূপাকার করতে লাগল। আপন কাজে ও ডুবে রইল। নাকে যে একগাদা ধুলো এসে ঢুকছে—তাতেও ওর খেয়াল নেই। মাথার পাগড়ির একটা খুঁট দিয়ে ও এক সময় নাকের উপর দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে নিল। তারপর ধীরে ধীরে ঝাঁট দিয়ে চলল।—নাঃ, টাট্টিখানার কাজ ধীরেসুস্থে করবার জো নেই। হাত চালিয়ে ঝট্‌পট্ করে নিতে হয়। এই ঝাঁট দেওয়ার কাজ ক্লান্তিকর, সময় সাপেক্ষ কিন্তু অনেক আরামের।

ছোট্ট ঝাড়ু। তা দিয়ে কি প্রাঙ্গণের অত জঞ্জাল ঝাঁট দেওয়া চলে? এক-এক জায়গায় ছোট ছোট স্তুপাকারে জড়ো করতে লাগলো জঞ্জালগুলো। পরে ঝুড়ি ভ'রে নিয়ে গেলেই হবে। জঞ্জালের এক একটা স্তুপের কাছে ও একবার খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে কপালের ঘামটা মুছে নিল। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি সুউচ্চ উদ্ধত চূড়া তুলে। সে চোখ তুলে তাকাল। পরক্ষণেই আবার ঝুঁকে পড়ে ঝুড়ির মধ্যে ভর্তি করতে থাকে আবর্জনার স্তুপ। মন্দিরের সিঁড়ির কাছে কাছে কখন যে ও এসে পড়েছে তা নিজেরই খেয়াল নেই। সর্বাঙ্গ ছমছম্ ক'রে উঠল। কেমন যেন ভয় হলো। মনে হলো অতিকায় এক মানবের মতো মন্দিরটা যেন এগিয়ে আসছে ওর দিকে, এক্ষুণি বুঝি গিলে ফেলবে। সে একটু ইতস্ততঃ করেছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই ও আবার সাহসে বুক বেঁধে মন্দিরে উঠবার মোট পনেরটা ধাপের পাঁচটা ধাপ এক লাফে উঠে থমকে দাঁড়াল। বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে। মাথাটা পড়ল ঝুঁকে। দু'এক সিঁড়ি আবার উঠে গেল। হঠাৎ হাঁটুতে একটা চোট খেয়ে পড়ে যেতে গিয়েছিল। পা দিয়ে শক্ত ক'রে সিঁড়ির ধাপগুলো আঁকড়ে ধরে টালটা সামলে নিল কোনোরকমে। উপরের ধাপের দিকে আবার পা বাড়াল। বরাত ওর ভালোই বলতে হবে। ভক্তবৃন্দের অবিরাম মাথা ঠুকে প্রণাম করার ফলে দরজার মার্বেল পাথরটা খয়ে গিয়েছে। অনেকটা ঘাড় উঁচিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখতে চাইল বখা। দেবালয়ের অভ্যন্তরে যাবার প্রবেশ-পথ ছিল এতদিন ওর কাছে অবরুদ্ধ—গোপন, রহস্যময়। দর-দালানের গোলক ধাঁধা ছাড়িয়ে পেতলের দরজার ফটক ডিঙিয়ে প্রশস্ত অন্ধকারময় এক প্রকোষ্ঠ। তারই প্রত্যন্ত প্রদেশের সুউচ্চ বেদীর উপর বখার দৃষ্টি গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সোনালী কাজ করা সিল্ক ও মখমলের পোষাক-পরিচ্ছেদে সজ্জিত পিতলের কয়েকটি দণ্ডায়মান মূর্তি। সুগন্ধ ধূপ-ধুনায় জায়গাটা ভরে গিয়েছে। ভালো ক'রে প্রতিমাগুলোকে নজরে আনা যায় না।

কিছু দূরে বসে আছেন অর্ধ-উলঙ্গ এক পুরোহিত। মুণ্ডিত মস্তকের ভৃগুদেশে একগুচ্ছ শিখা, শিখার প্রান্তভাগে একটা গিঁট। সামনে তার খোলা একখানা বিবর্ণ পুঁথি। পাশে কোশাকুশি, শাঁখ, ঘণ্টা প্রভৃতি পূজার সাজ সরঞ্জাম। দীর্ঘাকৃতি কুশ্রী অন্য একটি লোক দাঁড়িয়ে শাঁখ বাজিয়ে উঠল। উনিও একজন পুরোহিত হবেন বোধহয়। কোমরে একখানি কাপড়ের টুকরো কোনমতে জড়ান, প্রায় উলঙ্গই বলা চলে। মাথায় কালো একরাশ চুল; গলায় যজ্ঞোপবীত। বথা প্রথমে উঁকি মেরে দেখছিল। তারপর ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে রইল। সকাল বেলাকাব পূজো সুরু হয়ে গেছে।

'ওঁ, শান্তিদেব!' উপবিষ্ট পুরোহিত মশায় সহসা গম্ভীর কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ ক'বে উঠলেন। বাঁ হাতে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে তার সঙ্গে শঙ্খধ্বনির ঐকতান তুললেন। ক্ষুদ্র মন্দির প্রাঙ্গণের এতক্ষণ ঝিমিয়ে-পড়া নির্জনতা যেন ভেঙ্গে গেল। বাস্তবতার স্পর্শে মন্দিরটি জেগে উঠল। ভিতরকার নাট-মন্দির থেকে পূজারীর দল ঠাকুরের পূজামণ্ডপের দিকে ছুটলো 'শ্রীরামচন্দ্র কি জয়' বলে সমস্বরে চিৎকার করতে করতে।

গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে সুসংবদ্ধ মন্ত্রপাঠ সুমধুর সঙ্গীত তরঙ্গের মত বথার কানে এসে প্রবেশ করতে থাকে, মনটা ওর ভরে ওঠে কানায় কানায়। ও অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে :থাকে। অজ্ঞাতে হাত দু'টো কখন এক হয়ে গেছে। ভক্তিভরে মাথাটা ঝুলে পড়েছে অজানা, অচেনা, অপরিচিত কোন্ এক ঠাকুরের বন্দনার উদ্দেশ্যে।

'গেল,—গেল, সব অপবিত্র হয়ে গেল গো!'

আকাশ বাতাস চিরে সহসা একটা চিৎকার ওর কানে এসে পৌছল। চমকে উঠল। চোখের সামনে সব কি যেন অন্ধকার। জিভ আর গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আর্তস্বরে চিৎকার ক'রে উঠতে চাইছে বথা।

কিন্তু গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোল না। মুখ নেড়ে কথা কইতে চায়। কিন্তু পারে না। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ফুটে ওঠে ওর কপালে। ও যেন প্রাণহীন হয়ে গেছে।

সহসা ও নড়ে চড়ে উঠল। সোজা মাথা তুলে তাকাল চারদিকে। চোখের ঠুলিটা যেন এতক্ষণ পরে খসে পড়েছে। দেখল, মস্ত গোঁফওয়ালা এক বেঁটে পুরোহিত মন্দির প্রাঙ্গণের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সমানে হাত পা ছুঁড়ে হাঁকডাক, তর্জন-গর্জন, ছুটা-ছুটি লম্ফ-ঝম্ফ দিয়ে একাকার ক'রে তুলছে। রুদ্ধ চাপা কণ্ঠে চিৎকার করছে: 'গেল, গেল, সব অপবিত্র হয়ে গেল।'

'সর্বনাশ, সাংঘাতিক অঘটন একটা ঘটল দেখছি।' বখার মুখ দিয়ে আপনা থেকে বেরিয়ে পড়ল কথাটা। ক্রুদ্ধ পুরোহিতের পেছনে একটি নারী মূর্তির ওপর ওর চোখ দু'টি গিয়ে পড়ে। অবাক হলো, ভয়ও হলো। কি জানি কি সর্বনাশই না ঘটল। কিন্তু পেছনে ঐ নারী মূর্তিটাই যে সর্বনাশের মূল, ও তখনও তা টের পায় নি।

কিন্তু টের পেতে দেরী হলো না। একদল পূজার্থী হুড়মুড় ক'রে ছুটে এল মন্দিরের বাহির-দালানে। যেন যাত্রাদলের অভিনয়ের শেষ দৃশ্যে পাত্র-মিত্র কুশীলবেরা সবাই সার বেঁধে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে গেছে। বেঁটে, হাড়িসার পুরোহিত সিঁড়ির কয়েক ধাপ নীচে নাটকীয়ভাবে শূন্যে হাত তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ কি, সোহিনী না। ওই পুরোহিতের পেছনে কিছু তফাতে নাট-মন্দিরের এক কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে কেন জড়োসড়ো হয়ে?

'গেল—গেল—সব গেল অপবিত্র হয়ে গো।

বামুনটা তখনও সমানে চিৎকার ক'রে চলেছে। উৎসুক জনতা এবার যেন আন্দাজ করতে পারল ব্যাপারখানা। বামুনটার সঙ্গে সঙ্গে ওরাও হাত পা নেড়ে সমানে চিৎকার ক'রে উঠল। ক্রোধ, ভয় আর আক্রোশে

ফেটে পড়ছে সব। চোখে মুখে তাদের চাপা উত্তেজনা। বখাকে দেখে একজন খেঁকিয়ে উঠল :

'যা যা, নেমে যা সিঁড়ি থেকে, বেটা ধাঙ্গড় কোথাকার! দূর হ—দূর হ এখান থেকে বেটা হারামজাদা! আমা.দর পূজো-আর্চা সব দিলি নষ্ট ক'রে। মন্দিরটাকে পর্যন্ত অপবিত্র ক'রে দিলি। প্রায়শ্চিত্তির জন্য একগাদা পয়সা খরচান্ত হবে এখন। দূর হ-দূর হ, পথের কুকুর একটা, নেমে-যা।'

বখা তর্‌তর্‌ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল বামুনটার পাশ দিয়ে বোনের কাছে। প'র পর দু'টো সংশয় তার বুকে দানা বেঁধে উঠছে।

নিজের অপরাধের জন্য তার ভয় হয়। সোহিনী তখনও জড়োসড়ো হয়ে চুপ চাপ দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয় কোন অপরাধ করেছে, অঘটন ঘটিয়ে বসেছে কিছু। বোনের বিপদ আশংকায় মনটা ওর কেঁপে উঠল দুর্‌দুর্‌ ক'রে।

'ও বেটা হারামজাদাদের ছায়ার ত্রিসীমানায় পর্যন্ত যেতে নেই।' বেঁটে বামুন-টার ক্রুদ্ধ আস্ফালন বখার কানে এল :

'ও কিনা আমায় খামকা ছুঁয়ে দিল।'

'দূর হ—দূব হ—তফাৎ যা, তফাৎ যা।' পূজারীর দল সমানে চিৎকার ক'রে উঠল : শাস্ত্রে বলে, ছোটজাতরা মন্দিরেব ত্রিসীমানায় একশো আটত্রিশ হাতের মধ্যে এলেও মন্দির অপবিত্র হ'য়ে যায়। হারামজাদা বেটা, দেখো না, উঠে এসেছে সিঁড়ির ওপর, একেবারে দরজায় গোড়ায়। সবাইকে প্রায়শ্চিত্তি করতে হবে এবার। শুদ্ধির জন্য হোমের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কিন্তু আমি -আমি,' বেঁটে পুরোহিত হাত পা নেড়ে কি যেন বলছে, কথা শেষ করলে না।

সিঁড়ির ওপরকার লোকগুলো ধাঙ্গড় ছেলেটাকে পুরোহিত ঠাকুরের পাশ

দিয়ে যেতে দেখেছিল। তারা ভাবল ছোঁয়া লেগে ব্রাহ্মণ বুঝি জাত ধর্ম সব খুইয়ে বসেছেন। তাঁর জন্য তাদের মনে দুঃখ হলো। কি ক'রে তার সব অপবিত্র হয়ে গেল কেউ একবার জিজ্ঞেসও করল না, একবার জানলোও না নাট-মন্দিরের একপাশে ডেকে নিয়ে সোহিনী নাকের জল আর চোখের জল এক ক'রে দাদাকে যে ঘটনাটা বলল।

'ঐ লোকটা—ঐ লোকটা—ওদের বাড়ীর পায়খানাটা পরিষ্কার করছিলাম ; এমন সময় ঐ বামুনটা—মুখপোড়া ঐ বামুনটা—'সোহিনী ফুঁপিয়ে উঠল : 'ঐ বামুনটা এসে মিছিমিছি ঠাট্টা মস্কারি করতে লাগল আমার সঙ্গে। যা তা সব বলতে লাগল। আমি চেঁচিয়ে উঠতেই সে-ও চিৎকার ক'রে উঠল : আমায় ছুঁয়ে দিলে রে—আমায় ছুঁয়ে দিলে।'

সোহিনীর হাত ধরে টানতে টানতে বখা নাট-মন্দিরের মাঝখানে ছুটে এল। ভীড়ের মধ্যে বামুন ঠাকুরকে খুঁজে দেখল। কিন্তু তার টিকির সন্ধানটি কোথাও আর মিলল না। এমন কি সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ যে জনতা এতক্ষণ ধরে চিৎকার করছিল, ধাঙড়দের জোয়ান ছেলেটাকে মন্দিরের দিকে তেড়ে আসতে দেখে তারাও যে যে-দিকে পারল কেটে পড়ল। জনতাকে সরে পড়তে দেখে বখা থমকে দাঁড়ালো। তার হাতের দৃঢ় মুঠি দু'টি কন কন ক'রে ওঠে। চোখ দিয়ে যেন আগুনের হল্কা ছুটছে। ব্যর্থ আক্রোশে দাঁত দু'পাটি কড়মড় করছে ও। গলা ফাটিয়ে চিৎকার ক'রে বলে উঠতে ইচ্ছে করে ওর : 'দাঁড়াও, বামুন শালাটার কীর্তিখানা তোমাদের সব বলছি ?'

সব কটাকে মেরে সাবাড় করতে পারলেই যেন স্বস্তি পেত বখা, মাথায় যেন তার খুন চেপেছে। রাগে ক্ষোভে সর্বাঙ্গ ওর যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। থরথর ক'রে কাঁপছে। এমনি আর একটি ঘটনার কথা ওর মনে পড়ে। ঘটনাটা ও যেন শুনেছিল কার মুখে। ওর এক বন্ধুর বোন একদিন খড়কুটো কুড়িয়ে বাড়ি ফিরছিল মাঠের মধ্য দিয়ে। একলা পেয়ে জোয়ান এক অসভ্য

ছোকরা তার পিছু নেয়। ঠাট্টা-মস্করাও করেছে তার সঙ্গে। ব্যাপারখানা ওর ভাই জানতে পেরে আগুন হয়ে ওঠে। একখানা কুড়ুল হাতে ছুটে যায় সে মাঠের দিকে। বেয়াদব ছোকরাকে হাতের কুড়ুলখানা দিয়ে স্বহস্তে কেটে ফেলেছিল কুটি কুটি ক'রে। 'কি অপমান,' বখা ভাবে: 'ছোট একটি মেয়েকে একা পেয়ে অপমান ক'রে বসল শুয়ারের বাচ্চাটা। আর এদিকে খুব যে ভাল-মানুষী দেখান হচ্ছে, ভণ্ড কোথাকার! ব্যাটা নাকি আবার একটা বামুন। মিথ্যে কথা বলতে একটুও মুখে বাধে না। আবার বলে কিনা ছুঁয়ে অপবিত্র ক'রে দিয়েছে! বাপরে বাপ! বোনটাকে একা পেয়ে পাষণ্ডটা বলাৎকার না ক'রে থাকে!' বখার মনে সংশয় দানা বাঁধতে থাকে। সে সোহিনীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে চেঁচিয়ে উঠে:

'বল না, বল না আমায় একবার, বাড়াবাড়ি সে কিছু করে নি তো?'

সোহিনী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। কেবল মাথা নাড়ল। মুখে কিছু বলতে পারল না।

বখা অনেকটা আশ্বস্ত হলেও একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারল না। রাগে পেয়ে ব্যাটা বোধহয় কুপ্রস্তাব কিছু করেছিল। কি যে করল তাই ভাবছি! বাপরে বাপ! লোকটাকে আমি মেরেই ফেলব, খুন ক'রে ফেলব। সব ব্যাপারটা জানবার জন্যে ও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। বোনকে কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না। সন্দেহ-দোলায় ওর বুকটা উদ্বেলিত হতে থাকে। মুখ ফিরিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে:

'বল্ না সোহিনী, আমায় বল্। লোকটা বাড়াবাড়ি কিছু করেনি তো?'

বুকে মুখ গুঁজে মেয়েটা কেবল কাঁদতে থাকে। জবাব দেয় না।

'তুই বল্, আমায় একবার বল্। আমি ওকে আজ খুন ক'রে ফেলব। যদি—' চিৎকার ক'রে ওঠে বখা।

'ও—ও—ও আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে খালি ঠাট্টা-মস্করা করছিল।' সোহিনী অবশেষে মুখ খুলল: 'আমি তখন নীচু হয়ে ঝাড়ু দিচ্ছিলাম।

মুখপোড়াটা হঠাৎ পেছন থেকে এসে হাত বাড়িয়ে ফস ক'রে আমার—আমার,' সোহিনী একবার ঢোক গিললে। আবার বললে: 'আমার বুকে—'

'শুয়ার কা বাচ্চা!' তুবড়ির মত রাগে ফেটে পড়ল বথা: 'আমি গিয়ে এক্ষুণি ওকে খুন ক'রে ফেলব।' নাট মন্দিরের দিকে তেড়ে গেল ও অন্ধের মত।

'না না, দাদা, চলে এসো। চল আমরা বাড়ী যাই।' দাদার ওভারকোটের আস্তিনটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরল সোহিনী।

চোখ দু'টি তুলে বথা মন্দিরের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মুহূর্ত খানেক। বাইরে কোথাও একটিও জনপ্রাণী নেই। চারদিকে নিস্তব্ধ। ওর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিমেল স্রোত যেন নেমে গেল। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ গম্বুজ শোভিত বিরাট মন্দির। নির্মম, নিষ্ঠুর। তার ভয়াল বিশালতায় যেন আঁৎকে উঠতে হয়। কয়েক পা ও পিছিয়ে আসে। বুকটা ভয়ে দুরু দুরু ক'রে ওঠে। মনে হয় মন্দিরের দেবতারা যেন ওর দিকে চেয়ে আছেন কটমট ক'রে। দশ হস্ত—দ্বাদশ শির—জাগ্রত দেবতা যেন তাকিয়ে আছেন মন্দিরের বাইরে। বথার মাথাটা নত হ'য়ে আসে আপনা থেকেই। চোখ দু'টি আসে ঝাপসা হয়ে। হাতের দৃঢ় মুঠি দু'টো শিথিল হ'য়ে ঝুলে পড়ে দু'পাশে। দুর্বল হাঁটু দুটো যেন অবশ অসাড় হ'য়ে ভেঙ্গে পড়বে। অবলম্বন চাই। সোহিনীর কাঁধে ভর ক'রে কোনো মতে ও বেরিয়ে আসে মন্দিরের বাইরে।

পাশাপাশি ওরা দু'জনে হেঁটে চলেছে। বথার বুকটা টনটন ক'রে ওঠে বেদনায়। সোহিনী সুশ্রী, সুন্দরী, তন্বী। বোনের দেহ-সৌষ্ঠব সম্পর্কে আত্ম-সচেতন হয়ে ওঠে। কানে কানপাশা, হাতে তাগা, ভীরু সলজ্জ পা ফেলে চলবার সময় গায়ের অলঙ্কারগুলো বেজে ওঠে রিম ঝিম ক'রে—যেন চমক হানে বিজলী। চোখ মুখ আর তনু দেহলতা দিয়ে যেন খেলে যায় লাবণ্যচ্ছটা। আর কেউ যে ওর গায়ে হাত দেবে—ও ভাবতে পারে না।

স্বামী!—হোক না সে সাতপাকে ঘোরা শাস্ত্রমতে বিয়ে করা স্বামী। আড় চোখে সোহিনীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখে বখা। বিবাহিতা সোহিনীর অনাগত স্বামীটির কথা ওর কল্পনায় ভেসে ওঠে। সোহিনীর যেন বিয়ে হয়ে গেছে, স্বামী পেয়েছে ও। সেই অপরিচিত মানুষটি সোহিনীকে বাহুডোরে আবদ্ধ ক'রে সুডৌল পরিপূর্ণ স্তন দু'টি মুঠোয় ক'রে যেন আদর করছে। আর বোনটির স্মিত মুখে ফুটে উঠেছে পরম তৃপ্তি। অপরিচিত একটা লোক সোহিনীর অঙ্গ স্পর্শ করছে ভাবতেই ওর সর্বাঙ্গ ঘৃণায় রি রি ক'রে ওঠে। কি এক জিনিস যেন ও হারাবে বলে ওর ভয় হয়। কি যে ও হারাবে ঠিক বুঝতে পারে না, বার বার শুধু ভয় হয়। অচেতন মনে সোহিনীর ভাবী বরের বুঝি প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে নিজেকে—

'ছি ছি, এ আমি ভাবছি কি, আমি যে ওর ভাই—' বখা নিজের উদ্‌ভ্রান্ত মনের বল্গা টেনে ধরে সজোরে। মন থেকে যে গোটা ছবিটা লেপে মুছে ফেলল। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনের পর্দায় ফুটে ওঠে বেঁটে খাটো সেই মন্দিরের বামুন ঠাকুরটা। তার মুখটা মনে পড়তেই গায়ের রক্ত আবার টগবগ ক'রে ওঠে। প্রতিশোধের অনল জ্বলে ওঠে চোখে। লোকটার একটা কিছু করাই হলো প্রতিশোধ নেওয়া। দু' এক ঘা আচ্ছা ক'রে বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে কিংবা ঠেঙ্গিয়ে জানেপ্রাণে একেবারে মেরে ফেলাও যেতে পারে। শত সহস্র বৎসরের দাসত্ব-হীনতার অভিশাপ যদিও এদের শিরদাঁড়াকে ভেঙ্গে দুমড়ে অবনত ক'রে দিয়ে গেছে, তবুও কর্কটক্রান্তির এই উদাত্ত আকাশের অসীম প্রাণবন্যায় ওর উচ্ছল মনটি এখনও প্রাণবন্ত ও ভরপুর। নিজের প্রাণের পরোয়া ও করে না একটুও। এককালে তার পূর্বপুরুষেরা ছিল গাঁয়ের কিষাণ। হীন দাসত্বের নিগড়ে বাঁধা থাকলেও নিজেদের জীবনপথ নিজেরাই চালিয়ে গেছে। তাই তাদের রক্তধারা আজও বয়ে চলেছে ওর দেহের শিরা উপশিরায়। 'ইচ্ছে করলে এখনই বেয়াদব ভণ্ডটাকে দু' এক ঘা বসিয়ে দিতে পারি।' আপন মনে বিড়বিড় ক'রে বলে বখা।

মহৎ কিছু করতে গেলে অতিমানবীয় অপূর্ব এক দীপ্তিতে মুখখানা ওর উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। আক্রান্ত বাঘের সেই মরিয়া অপরূপ যেন ফুটে উঠেছে ওর দেহে। তবু কিন্তু বুকে ওর জোর নেই। বাপ-ঠাকুরদার আমলের পুঞ্জীভূত সংস্কার আর রীতি-নীতির দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ডিঙিয়ে এক পা যেতে যে পারে না ও। ও পারে না ডিঙোতে বামুন ঠাকুরদের রক্ষাব্যূহ, ছোটলোকদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে যে তারা। সুতরাং ওর মনের যখন চরম শক্তির আলোড়ন উঠছে, সেই মুহূর্তে মনের কন্দরে অবস্থিত সমাহিত হীন দাসত্ব মাথা উঁচিয়ে ওঠে, ওকে টেনে সরিয়ে দেয় পিছনে। আহত পশুর মত ফুঁসে ফুঁসে ওঠে, গোঙায় ব্যর্থ আক্রোশে।

ব্যস্ত কোলাহল মুখরিত রাজপথ দিয়ে মন্দির থেকে ভাইবোন দু'জনে বেরিয়ে এল। এখানে ওখানে নানান্ দৃশ্যের সমাবেশ! চোখ তুলে ভালো ক'রে একবার ও দেখলও না সেদিকে; কান পেতে কিছু শুনলও না। কিছু বলতেও তার ইচ্ছে হলো না। 'ছুটে গিয়ে ঐ ভণ্ড পামর বামুনটাকে খুন ক'রে এলাম না কেন!' মনে মনে বলছে বারে বারে। 'সোহিনীর জন্য না হয় জান দিতামই। সবাই ব্যাপারটা জেনে যাবে এর পরে।··· আহা, বেচারী বেঁটে বামুনটাকে যখন মারতে গেলাম তখন আমায় রুখে দিলি কেন? লোকের কাছেই বা মুখ দেখাবি কি ক'রে? আমাদের ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মে অমন কলঙ্কের ডালি আনলি কেন বয়ে? ফুটফুটে অমন সুন্দর না হলেই কি পারতিস্ না? ভগবান তোকে কুরূপা ক'রে তৈরি করলেন না কেন, তাহ'লে তো কারও নজর পড়ত না তোর ওপর!' কুশ্রী কুরূপা সোহিনীর কথা ভাবতেই ওর মনটা ব্যাথায় টন্‌টন্ ক'রে উঠল। 'হে ঈশ্বর, অমন সুন্দরী হয়ে আমাদের ঘরে ও জন্মাল কেন!' বখা শুধায় আপন মনে। আড়চোখে একবার তাকায় বোনের দিকে। দেখে, সোহিনী মুখ ফিরিয়ে আপন বসনের প্রান্ত দিয়ে থেকে থেকে চোখের কোণ মুছছে। সহসা বখার বুকটা গলে গেল। সোহিনীর একখানা হাত

সস্নেহে মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে এগিয়ে চললো। অন্তরে চলেছে ক্ষুব্ধ ঝড়, নিরাশায় কাঁপে ও।

কিছুদূর গিয়েই বিক্ষুব্ধ মনটা অনেকটা হাল্কা হয়ে এল। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল।

'তুই কি এখন বাড়ী যাচ্ছিস সোহিনী?'

সোহিনী দাদার পিছু পিছু আসছিল। লজ্জা আর সংমে মাথাটা তার ঝুঁকে পড়েছিল। ভাবছিল লোকের কাছে সে এখন মুখ দেখাবে কি ক'রে? এমন সময় দাদা সহসা বলে ওঠে: হ্যাঁ, তুই বরং বাড়ীই যা। আমি গিয়ে খাবারটা নিয়ে আসছি। ঝাড়ু ও ঝুড়িটা তুই বরং নিয়ে যা।'

সোহিনী দাদার মুখের দিকে তাকাতে পারল না। মাথা নেড়ে সায় দিল। দাদার হাত থেকে ঝুড়ি ও ঝাড়ুগাছটা নিয়ে সে মন্থর পা ফেলে চললো শহরের ফটকের দিকে। মাথার কাপড়খানা মুখের উপর খানিকটা সে টেনে দিল।

অপস্য়মানা বোনটির দিকে বথা চোখ দু'টি তুলে তাকাল একবার। তারপর দেবতাদের আবাস স্থল মন্দির ছেড়ে হেঁটে চলে ধীরে ধীরে।

'হৈ হৈ, হট্ যাও, হট্ যাও, ধাঙ্গড় আসছে।' সহসা ও হুসিয়ারী-হাঁক হেঁকে উঠল। আর একটু হলে নগ্নপদ এক হিন্দু দোকানদারকে ছুঁয়ে দিয়েছিল! দোকানদারটি তখন এক দোকান থেকে অপর দোকানে ধর্মের ষাঁড়ের মত ছোটাছুটি ক'রে বেড়াচ্ছিল। ঘিঞ্জি লোহার বাজার ছাড়িয়ে, না-বিলিতী না-ভারতীয় পাঁচমিশালী পোষাক পরা একটা ভিখারীকে পেছনে রেখে, বুড়ো . আতরওয়ালা ও আর একটা ফলের দোকানের মাঝখানের এক ফাঁকা জায়গায় কখন এসে পৌছল ও নিজেই জানে না। বুকখানা ওর অনেকটা হাল্কা হয়ে গেলেও তখনও তার মধ্যে কিন্তু তুমুল ঝড় বইছিল। বাইরে থেকে দেখে তা বুঝবার উপায় নেই। গলির মুখে এসে ভাবল

বধা : হ্যাঁ, গলিতে আমাকে খাবার আনতে যেতে হবে।' গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়ে ও।

গলির একস্থানে বেওয়ারিশ রোগা ঘেয়ো কুকুব একটা বসে ছিল, একঝাঁক মাছির কামড়ে উদ্‌ব্যস্ত হ'য়ে উঠছিল সে। রোগা হাড্ডিসার আর-একটা কুকুর তখন নদমার মুখে বসে পচা খাবার খাচ্ছিল। একেবারে গলির ডানদিকে কিছুদূবে একটা গরু পথ জুড়ে শুয়ে রয়েছে। বধা দেখল, গলিটার এখানে ওখানে নোংরা আবর্জনা সব জমে আছে। গরু আর কুকুর দু'টোকে ওখানে থেকে হটিয়ে না দিলে নয়। কুকুর দু'টোর দিকে ও তেড়ে গেল। আঁতকে উঠে বেচারীরা পালিয়ে গেল কেঁউ কেঁউ চিৎকার ক'রতে করতে। কিন্তু মুস্কিল হ'লো পরম পবিত্র গোমাতাটিকে নিয়ে। বধাব তাড়নাতে একটুও কিছুমাত্র বিচলিত হ'লো না গোমাতা, পরম নির্বিকারে আগের মতই পড়ে রইল রাস্তা জুড়ে। বধা ওকে খোঁচাতে সাহস পেল না। কেননা, যে সব ধনীলোকের বাড়ীর সামনে গরুটা পড়ে থাকে তা'রা হয়ত দেখতে পেয়ে এক্ষুণি মারতে আসবে। তাই ও দু'হাতে গরুটার শিং দু'টো ধরে রাস্তাটা পেরিয়ে গেল পাশ কাটিয়ে। নাঃ গলিটার এখানে ওখানে এত আবর্জনা পড়ে আছে, সোহিনী কি আজ সকালে ঝাঁট দেয়নি! কাজের বেলায় এমন গাফিলতি করা ঠিক নয়। মন্দিরের সেই বামুনটার হাতে তা'র চরম অপমানের কথা ভেবে ও তা'র সব অপরাধটা আজ ঝেড়ে ফেলল মন থেকে, অমন নিগ্রহের পর কারো কি মাথা ঠিক থাকে? না, কাজকর্মে কারো ঠিকমত মন বসে? কিন্তু সোহিনী যে মন্দিরে যাবার আগেই গলিটা ঝাঁট দিয়ে গেছে কিছুতেই ওর মন তা মানতে চাইল না।… এক তামা-পিতলের দোকানদার তা'র ছোট্ট অন্ধকাব দোকানে বসে বসে হাতুড়ি দিয়ে তামার পাতা পেটাচ্ছিল। হাতুড়ির টুং-টাং শব্দ দূর থেকে বধার কানে ভেসে এল। সোহিনীর গাফিলতির কথা মন থেকে তা'র নিঃশেষে মুছে গেল। বুকটা অনেকটা হাল্কা হ'য়ে গেল। এগিয়ে চলল ও। সামনে

ছোট গলির এক বাড়ীতে তাকে যেতে হবে খাবার আনতে। কিন্তু রাস্তার মাঝখানেই আবার স্নান করতে বসেছেন পরম ধার্মিক জনৈকা হিন্দু বৃদ্ধা। সারা গায়ে তার তেল কুঁচকুঁচ করছে। পরনে গামছা ছাড়া আর কিছু নেই বললেই চলে। পাশ কাটিয়ে যেতে হলেই বখাকে তিনি জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে দেবেন।

বখা তাই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। ধার্মিক বুড়ীটি ঝপ্ ক'রে এক বাল্‌তি জল সশব্দে মাথার উপর ঢেলে দিয়ে খালি বাল্‌তিটা আবার ছুঁড়ে দিল রাস্তার পাশের কুয়োয়। এই সুযোগে বখা ওর গন্তব্য স্থল স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। সঙ্কীর্ণ গলি। মোটা দু'জন লোক পাশাপাশি চলা দায়। তবে গলিটা অনেকটা নিরিবিলি। দোকানদারের হাতুড়ির সেই টুং-টাং আওয়াজটিও আর বিশেষ কানে আসছে না। কিন্তু ধৈর্যের পরীক্ষা এখনও যেন ওর শেষ হয়নি। অচ্ছুৎ ও। গৃহস্থবাড়ীর সিঁড়িতে ওঠাও নিষেধ। ছোঁয়া লেগে সিঁড়িটা অপবিত্র হয়ে যাবে যে। কিন্তু রান্নাঘরগুলো হলো উপরের তলায়।

উপায় কি? চিৎকার ওকে করতেই হবে খাবারের জন্য। হাঁক ছেড়ে তাকে নীচু থেকে জানিয়ে দিতে হবে ওর আগমন-বার্তা।

'ধাঙড়ের রোটি-মাইজি, ধাঙড়ের রোটি!' নীচের তলায় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বখা চিৎকার ক'রে উঠল। গলির মাথা থেকে টক্ টক্ ক'রে অবিরত যে শব্দটা আসছিল তাতে বুঝি তার কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেল। আরও জোরে চিৎকার ক'রে উঠল ও:

'ধাঙড় এসেছে মাইজি! ধাঙড়ের রোটি দিন্!' কিন্তু এত চিৎকারেও কোনো ফল হলো না। কোনো সাড়া মিলল না ওপর থেকে।

দরজার কাছে আরও কয়েক পা ও এগিয়ে গেল। আবার হাঁক ছাড়ল। 'ধাঙড় এসেছে মাইজি, ধাঙড়ের রোটি দিন্।'

উপরতলা থেকে কোনো সাড়াশব্দ এল না। বেলা পড়ে এসেছে। ও জানত

এই সময়টা বাড়ীর গিন্নি হেঁসেলের পাট চুকিয়ে নীচে নেমে আসে। ঘরের বারান্দায় বা গলির নর্দমাটার মুখে বসে সবাই মিলে গল্প-গুজব করতে থাকে। কেউ কেউ বা চরকার সুতো কাটতে থাকে।

'ধাওড়ের রোটি মাইজি!' বখা আবার হেঁকে উঠল।

এবারও কোনো সাড়া আসে না। ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা দু'টো, ওর কন্‌কন্ ক'রে ওঠে। সর্বাঙ্গ যেন অসাড় হয়ে আসে। নড়বড়ে ঢিলে হয়ে যায় পায়ের জোড়াগুলো। কোনো কাজে আর ওর মন বসে না। একান্ত মনমরা হয়ে গলির একটা বাড়ীর কাঠের সিঁড়ির নীচে ও বসে পড়ে। ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিল ও, ক্ষুব্ধ, বিরক্ত হয়ে উঠছিল। ক্ষোভের চাইতে অবসাদটাই যেন ছাপিয়ে ওঠে। চোখ দু'টো তন্দ্রায় ঢুলে আসে। আধখোলা ঘরের প্রকাণ্ড দরজাটার দিকে চোখ দু'টি মেলে দেখবার চেষ্টা করে। ভালো করেই তো ও জানে যে, ওর স্থান গৃহস্থ-ঘরের সিঁড়ির তলায় নয়। স্থান বাইরের নোংরা নর্দমার পাশে ভিজে স্যাঁতসেঁতে গলিটায়। তা হোক্; অতশত মানলে চলে না। হাটু দুটো মুড়ে একটা কোণ দেখে ও বসে পড়ল। ঘুম নেমে আসে চোখ দু'টিতে।

ক্লান্ত অবসন্ন দেহ ঘুমে ভেঙ্গে পড়তেই খাপছাড়া অলীক, উদ্ভট কল্পনা সব, অতৃপ্ত যত বাসনা, উঁকি মারে ওর সুপ্ত মনেব আনাচে কানাচে। স্বপ্ন দেখে ও। জনাকীর্ণ নগরীর অপরূপ এক রাজপথ ধরে সুশ্রী, সুবেশ, হাস্যমুখর একদল বরযাত্রীর সঙ্গে ও যেন চলেছে গরুর গাড়ীতে চেপে। আর ওর সামনে রঙীন হলদে কাপড়ে ঢাকা একখানা দোলনা কাঁধে ক'রে নিয়ে চলেছে জন চারেক লোক। পুরোভাগে চলেছে একদল শিখ ব্যাণ্ড বাজিয়ে। পরনে তাদের গোরা ফৌজ পোষাক। কারো হাতে ক্ল্যারিওনেট, কারো কারো বা ফ্লুট, বিউগল, সুপারস্যাক্সোফোন আর ড্রাম। অমন বাজনা কতদিন ও শুনেছে ক্যাণ্টনমেণ্টে। কিন্তু এ যেন তেমন মন মাতানো নয়। না আছে সুর, না আছে তাল, লয়। খালি বেসুরে বাজিয়ে চলেছে ব্যাণ্ড। তারপর

াক রেলস্টেশনে ও যেন এসে পড়ল। একখানা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফরমে। ইঞ্জিনের পেছনে চারদিক ঘেরা পরপর চল্লিশ খানা মালগাড়ীর ওয়াগন। কোনোটাতে পাথরের নুড়ি আর কোনটাতে স্তূপাকারে রয়েছে কাঠ। বথা দেখল, অমন একটা মালগাড়ীতে ও যেন চেপে বসেছে। পাশে ওর একটা পুঁটুলি। হাতে রূপোর বাঁটওয়ালা একখানা ছাতা; মাথায় শোলার টুপী। আর মুখে ওর বাবার হুঁকোর গুড়গুড়িটা। সহসা ওর মনে হলো মালগাড়ীটা যেন গায়ের আড়মোড়া ভেঙ্গে নড়ে উঠল। পরক্ষণেই কানে এল একটা কিচ্ কিচ্, মচ্ মচ্, কড়্, কড়, ঝপঝপ শব্দ। মনে হলো আশেপাশে কোথাও যেন একটা লোক খুন হয়েছে। ভয়, আতঙ্ক, আর করুণায় মনটা ওরে গলে গেল। স্বপ্নে দেখল, মাল গাড়ীটার নীচে ঝুঁকে দেখবার জন্য ও যেন মুখ বাড়িয়েছে। হ্যাঁ, তাইতো, নীল পোষাক পরা রেলের একদল কুলি একখানা মালগাড়ী ঠেলে নিয়ে চলেছে রেলওয়ে শেডের দিকে।...তারপর ও যেন এসে পড়ল এক অজ পাড়াগাঁয়ে। এক হাঁটু ধুলোভর্তি গাঁয়ের সঙ্কীর্ণ মেঠো পায়-হাঁটা পথ...দু'পাশেই নালা, ডোবা, খাল, বিল। গরু চরে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে। ও যেন দেখছে দু'খানা প্রকাণ্ড গরুর গাড়ী একরাশ বোঝা নিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করতে করতে আসছে ওদিক থেকে। গাড়ীর চাকাগুলো কোথাও কাদাতে বসে গিয়েছে। চাকার গায়ে সব কাদা। কিছু দূরেই বাজার। একঝাঁক চড়ুই পাখী উড়ে এসে বসল বাজারের দোকান গুলোর ওপর। খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে তারা দোকানীর চাল ডাল।...একটা দাঁড়কাক কোত্থেকে উড়ে এসে বসল একটা বলদের বাঁকা ককুদের ওপর। ব'সে পরম নিশ্চিন্তে ঠোকরাতে লাগল বলদের ঘাড়ের ঘাটাকে।...ও যেন আরও দেখল, ছোট্ট একটা মেয়ে এসে দাঁড়াল এক মিষ্টির দোকানের সামনে। খাবারের ঠোঙাটা হাতে নিয়েই মেয়েটা হেসে ফেলল, কি মিষ্টি হাসি! তারপর নাচতে নাচতে চলল বাড়ী। এমন সময় মড়াখেকো সেই কাকটা উড়ে এসে মেয়েটার হাত থেকে ছোঁ মেরে ঠোঙা শুদ্ধ খাবারটা ফেলে দিল

খানার মধ্যে। মেয়েটা কেঁদে উঠল। পাশেই এক মোটাসোটা সুশ্রী সেকরার দোকান। হাপরের কাছে বসে একখানা রূপোর অলঙ্কারের উপর একটা ফুলের নক্সা কাটছিল সে। মেয়েটার কান্না শুনে সে তাকাল মুখ তুলে। একটু হাসলও। তারপর চিমটেটা দিয়ে টকটকে লাল একটা কয়লা বাড়িয়ে ধরল মেয়েটার দিকে।···এমনি দেখে স্বপ্ন বখা। ও যেন আরো দেখে এক পাঠশালার সামনে এসে পড়েছে। নীল পাগড়ি পরা বাচ্চা পড়ুয়ার দল পণ্ডিত মশায়ের সামনে বসে চেঁচিয়ে সুর ক'রে পড়ছে আর লিকলিকে বেত হাতে পণ্ডিত মশায় বসে আছেন ওদের সামনে। কটমট ক'রে তাকাচ্ছেন বারবার ওদের দিকে। পড়ুয়ারা মুখে মুখে আওড়ে চলেছে তাদের পাঠ। স্বপ্নে দেখা অপরূপ সেই আজব নগরীর পাশ কাটিয়ে বয়ে চলেছে একটা স্বচ্ছ করতোয়া। আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে গম্বুজ তোলা এক সুবিশাল অট্টালিকা। পাথর কেটে কেটে খোদাই-করা। ভিতর দালানের কার্ণিশ-গুলোয় কি অপরূপ সব কাজ! খোদাই-করা অপূর্ব সৌন্দর্য-বিভব প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে বখা। মুগ্ধ, অবাক-বিস্ময় ছাপিয়ে ওঠে ওর চোখেমুখে। প্রাসাদের ভিতরটা লাল, নীল, সবুজ, সোনালী নানান্ রঙে চিত্র বিচিত্রিত। অট্টালিকার অভ্যন্তরভাগ যেন হলঘরের মত। দু'পাশে মনোরম কারুকার্য খ'চিত থামের পর থাম। শেষের দিকটায় খানিকটা বারান্দার মত। ওখানে শীর্ণ রুগ্ন এক বৃদ্ধকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে অনেক লোক। প্রাসাদ সংলগ্ন মন্দির থেকে জনকয়েক সৈন্য বেরিয়ে এল···হি হি ক'রে হাসছে আর কথা বলে চলেছে। শীর্ণকায় রুগ্ন বৃদ্ধকে কাঁধে ক'রে ওরা মাঠ পেরিয়ে চলল শ্মশান ঘাটের দিকে। শ্মশানে গত রাত্রির চিতাগুলো তখণও নেভেনি। পোড়া কাঠগুলো থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। শ্মশানের শবগুলোকে আগলে রয়েছে জনকয়েক সন্ন্যাসী। চিতা থেকে ওরা মুঠি মুঠি ছাই তুলে মাখছে নিজেদের চুলে, মাথায়, সর্বাঙ্গে। এক গোরা সাহেব এককোণে দাঁড়িয়ে দেখছিল, মুখে তার বিদ্রুপের হাসি। হঠাৎ যেন বখা

দেখে, মুণ্ডিত মস্তক এক নাগা যোগী পুরুষ কি সব মন্ত্র আউড়ে নিমেষের মধ্যে সাহেবটাকে ছোট্ট একটা কালো কুকুরে রূপান্তরিত ক'রে দিলেন। যোগী বাবা তখন ধ্যানে বসেছিলেন। বয়স বলে তাঁর দশহাজার বছরেরও ওপর। বখা ট্যাঁক থেকে প্রণামী দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু ওঁর চেলাচামুণ্ডারা বারণ করলে। সন্ন্যাসী এতদিন বেঁচে আছেন কি ক'রে, বিস্মিত বখা ভাবছিল হাঁ হয়ে। এমন সময় হঠাৎ গাছ থেকে একঝাঁক বানর লাফিয়ে পড়ল ওর সামনে।

দিবা স্বপ্নের ঘোর হঠাৎ কেটে গেল বখার। মুখ বাড়িয়ে ও দেখল, উঁচু বাড়ীগুলোর মাথায় রোদ এসে চিক্‌চিক্ করছে। বেলা প্রায় দু'টো হবে। ও জানে এই সময়টায় সাধু-ফকিররা বেরোয় মুষ্টি ভিক্ষার জন্য ভক্ত গৃহস্থদের দোরে দোরে। ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। চোখ দু'টো দু'হাতে একবার রগড়ে নিল।—না, সবুরে মেওয়া ফলে। সাধু সন্ন্যাসী অতিথিদের বিদেয় না ক'রে খাওয়া-দাওয়ার পাট গৃহস্থ বাড়ীতে কেউ নিশ্চয় চুকিয়ে দেয় না। ওর বরাতেও খাবার জুটে যাবে নিশ্চয়ই। তারপর সাধুটির দিকে ও চোখ তুলে তাকায়, উঠে দাঁড়ায় না। সাধুবাবাও ওর দিকে তাকিয়ে দেখে। কিন্তু বখার চোখে রাজ্যের ঘুম জড়ো হয়েছে।

'বম্! বম্! ভোলানাথ!' হাতের লৌহ কঙ্কন বাজিয়ে সাধুটি চিৎকার ক'রে ওঠে। সাধুর চিৎকার শুনে দু'জন স্ত্রীলোক ছুটে এল বারান্দায়।

'এই যে বাবা, আপনার সিধে নিয়ে আসছি।' একজন স্ত্রীলোক ছুটে এল সাধুর হাঁক শুনে। তারপর বাইরে সিঁড়ির নীচে বখাকে বসে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল সে।

'মুখপোড়া বেজন্মা', খেঁকিয়ে ওঠে স্ত্রীলোকটি। 'মরণ হয় না তোর, মরতে পারিস না? ওঠ, ওঠ ওখান থেকে বেরিয়ে যা। বাড়ীখানা আমার অপবিত্র করে দিলে গা! পিণ্ডি গেলার আয়োজন চাইতো হাঁকতে পারিসনি বাইরে থেকে মুখপোড়া? একি তোর বাপের বাড়ী পেয়েছিস।'

তড়াক্ ক'রে বখা উঠে দাঁড়ায়। চোখ দু'টি দু'হাতে কচলে গায়ের আড়ষ্ট ভাবটাও যেন ঝেড়ে ফেলে! তারপর হাত দু'টি জোড়া করে ক্ষমা চেয়ে বলে :

'আমায় ক্ষমা করুন, মা। রুটির জন্য আমি আপনাকে অনেকবার ডেকে ছিলুম। আপনি তখন ব্যস্ত ছিলেন কিনা তাই শুনতে পাননি। বড় হাঁপিয়ে উঠেছিলাম তাই ওখানটা একটু বসে পড়েছিলাম।'

'অমন যদি বসতেই হয়, তবে দোরগোড়ায় কেন, গলিতে গিয়ে বসতে পারলি নে, হতচ্ছাড়া মুখপোড়া? জাত গেল আমার, ধর্ম গেল, সারা বাড়ীটা আমায় গঙ্গাজল ছিটোতে হবে। মাগো, কালে কালে কিনা হচ্ছে! ছোটলোকগুলো বামন হয়ে কিনা আকাশের চাঁদ ধরতে চায়! মন্দিরে আজ পূজো দিয়ে এলাম —মঙ্গলবারের অমন সকালটা—'। তারপরে সাধুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্ত্রীলোকটি তার রসনা সংযত করল।

'একটু সবুর করুন বাবা।' খাদে নেমে এল তার স্বর: 'এক্ষুণি গিয়ে আপনার সিধে নিয়ে আসছি। মুখপোড়া এসে আমার দেরী ক'রে দিলে। রুটির খোলাটা চাপিয়ে এসেছি উনুনে। সব কটা রুটি নিশ্চয় পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল।'

বারান্দা থেকে সে সরে গেল। অপর যে স্ত্রীলোকটি ছুটে এসেছিল বারান্দায় সাধুর গলা শুনে, শান্ত প্রকৃতির অনেকটা সে, একটু স্থুল। এক হাতে সাধু বাবাব জন্য খানিকটা চাল আর অপর হাতে বখার জন্য একখানি চাপাটি নিয়ে সে নীচে নেমে এল। ডান হাতের চালটি সাধুটির ঝোলার মধ্যে ঢেলে দিয়ে চাপাটিখানা দিল বখাকে। সস্নেহে বললে :

'গৃহস্থবাড়ীর দোর গোড়ায় অমন ক'রে কি বসতে আছে বাছা?'

'দীর্ঘজীবী হও মা, দীর্ঘজীবী হও। পরিবারের সকলের মঙ্গল হোক!'

সাধু দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করল। 'খানিকটা ডাল দেবে মা?'

'হ্যাঁ সাধুজী, কাল থেকে তাই দেব। হাত দু'টো আজ জোড়া, রান্না নিয়েই বড় ব্যস্ত আছি।' ছুটে সে ওপরে চলে গেল।

গোটা বাড়িটা অপবিত্র হয়ে গেছে বলে যে স্ত্রীলোকটা বখাকে এতক্ষণ ধরে বক্‌ছিল সে এবার নীচে নেমে এল। কটমট্‌ ক'রে ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল :

'ওয়াক্—থুঃ। সারা সক্কালবেলা যত বাজ্যের নোংরা ঘেঁটে এসে একেবারে ঘরে উঠে এলি যে?'

সাধু বাবার দিকে ফিরে চারটি ভাত আর খানিকটা ডাল-তবকারি সাধুর কালো করোটিটার মধ্যে ঢেলে দিয়ে বললে :

'আজ এই নিন। কিন্তু অশুচি হয়নি বাবা। ধাঙড় বেটা সত্যিই কিছু ছুঁয়ে দেয়নি আমাদের। দয়া ক'রে একটু দাওয়াই দিয়ে যান বাবাজী, ছেলেটি যেন ভালোয় ভালোয় সেরে ওঠে জ্বর থেকে।'

'তোমাব মঙ্গল হোক্‌ বাছা, তোমার ছেলে-পুলেদের মঙ্গল হোক্‌। কাল সকালে আমি একটা ওষুধ এনে দেব।' সাধু এবার বাইরের দিকে পা বাড়াল।

'মরতে পারিস নে!' এবার বখার দিকে তাকিয়ে স্ত্রীলোকটি ঝংকার দিয়ে উঠল : 'খাবার নিতে এসছিল, ভাই-বোন আজ সকাল থেকে কি কাজটা করেছিস শুনি? তোর বোনটা তো আজ গলিটা পর্যন্ত ঝাঁট না দিয়ে চলে গেছে। আর তুই বাড়ীখানা পর্যন্ত অপবিত্র ক'রে দিলি। নর্দমাটা আগে পরিষ্কার ক'রে আয় গে, তবে রুটি পাবি। যা, যা, কিছুটা কাজ ক'রে আয় গে, বাড়ীটা তো ছুঁয়ে অপবিত্র ক'রে দিলি।'

বখা চোখ তুলে একবার তাকাল মুখরা স্ত্রীলোকটির দিকে। নির্বিকার চিত্তে গালাগালটা হজম ক'রে নেয় ও। উঠোনের একপাশে কাঠের পৈঠাটার নীচে হাত ঢুকিয়ে দিলে। ও জানত সোহিনী তার ছোট ঝাড়ু গাছটা রোজ লুকিয়ে রাখে ওখানে। তারপর ঝাঁট দিতে লেগে গেল ও।

'মা আমি পায়খানায় যাচ্ছি।' ছোট্ট একটা ছেলে ওপরতলা থেকে চিৎকার ক'রে উঠল।

'না না, ওপরে গিয়ে কাজ নেই।' ছেলেটার মা বখার কাজ তদারক করতে করতে জবাব দিল: 'ওপরের পায়খানায় যাস নে বলছি, ময়লাটা তা'হলে সারাদিন পড়ে থাকবে। চট ক'রে নীচে নেমে আয় না। নর্দমায় গিয়ে বসগে। ঝাঁওড়টা রয়েছে পরিষ্কার ক'রে নেবে 'খন।'

রাস্তায় অতগুলো লোকের সামনে পুরীষ ত্যাগ করতে ছেলেটার বুঝি লজ্জা করছিল। সে মাথা নাড়ল: 'উঁহু।'

মা তেড়ে গেল ছেলেটার দিকে। বখার জন্য যে রুটিটা এনেছিল বখাকে দিতে তা ভুলেই গেল। ওপরে গিয়ে জোর ক'রে ছেলেটাকে নীচে পাঠিয়ে দিল। তারপর বখাকে ডেকে বলল:

'এই বখিয়া, এই নে তোর রুটি।' রুটিখানা সে বখার দিকে ছুঁড়ে দিল ওপর থেকে।

বখা হাতের ঝাড়ুগাছটা পাশে রেখে দিয়ে পাকা ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মত রুটিখানা লুফে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু কাগজের মত ফিন্‌ফিনে রুটিখানা ঘুড়ির মত উড়তে উড়তে এসে পড়ল ভিজে স্যাঁতসেঁতে গলিটার মাঝখানে। বখা চট ক'রে রুটিখানা তুলে নিল। তারপর চাপাটির সঙ্গে পুঁটলিতে বাঁধল। সামনেই ছেলেটা মলত্যাগ করছিল। নর্দমাটা পরিষ্কার করতে ওর ইচ্ছে হচ্ছিল না। বিরক্তি লাগছিল। ঝাড়ুখানা জায়গায় রেখে দিয়ে বাড়ীর দিকে ও পা বাড়াল। রুটির জন্য গিন্নীকে ধন্যবাদ দিতে ভুলে গেল। গৃহকর্ত্রীর নজর এড়াল না তা। চেঁচিয়ে উঠল:

'ওমা, আজকাল তোরা দেখছি রীতিমত বড়লোক হয়ে গেছিস্! উইপোকার পাছায় ডানা গজাল কবে থেকে র‍্যাঁ!'

'আমার হয়ে গেছে মা,' ছেলেটা নীচে থেকে চিৎকার ক'রে উঠল।

'পাশের বাড়ীর আচার-ওয়ালাদের কাউকে একটু জল দিতে বল্ না, বাবা। ওরা কেউ না থাকলে ধূলো দিয়ে পুঁছে নে।'

সিঁড়ির তলায় খানিকটা ঘুমিয়ে নেওয়ার পর ও ভেবেছিল সকালবেলাকার সব পুঞ্জীভূত রাগ আর অপমানের দুর্বিসহ বোঝাটা যেন নেমে গেছে ওর বুক থেকে। বুঝি মনের সব বিক্ষুব্ধ উত্তাপ উবে গেছে। কিন্তু পুরনো ক্ষতটা আবার যেন চাড়া মেরে চিতিয়ে উঠছে। মনটা টনটন্ ক'রে উঠছে। কান দু'টো উত্তপ্ত। 'মন্দিরের দিকে আমার না গেলেই আজ ঠিক হতো,' বিড়বিড় ক'রে আপন মনে বলে বখা: 'রুটি ক'খানা তাহলে সোহিনী এসে নিয়ে যেতে পারত। এখানে আসতে আমাকেই বা কে সেধেছিল? মন্ত্রমুগ্ধের মতো ও চলল হেঁটে। দিনভর নোংরা কাজ নিয়ে পড়ে থাকলেও পরনের বিলিতী পোষাক এক নতুন মর্যাদাবোধে ওকে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছে। চোখ দু'টি তার জ্বলে ওঠে, নিজের মনের সঙ্গে ওর দ্বন্দ্ব বাধে: নোংরা গলি থেকে রুটিখানা কুড়িয়ে না নিলে কি চলত না?' ছোট একটা নিশ্বাস ওর বুক থেকে বেরিয়ে আসে।

ভয়ানক খিদে পেয়েছিল বখার। মনে হয় এক পাল ক্ষুধিত ইঁদুর পেটের ভিতর ধারালো দাঁত দিয়ে কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে খাচ্ছে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মুখের থুতুটা পর্যন্ত সাদা টানা আঠার মত হয়েছে। থুঃ ক'রে খানিকটা থুতু ও ফেললে মাটিতে।

শহর ছাড়িয়ে ও হেঁটে চলল এবার ওদের অচ্ছুতপল্লীর ঘরের দিকে। শরীরটা যেন ওর ভেঙ্গে পড়ছে। পা দু'টো চলতে চাইছে না। মাথার পাগড়ী খুললেই এখনি টস্‌টস্ ক'রে ঘাম ঝরে পড়বে কপাল বেয়ে। মুখ তুলে তাকায় সূর্যের পানে। সূর্য উঠে এসেছে মাথার ওপর। 'তাইতো, বেলা যে অনেক হয়েছে! মাত্র খান দুই চাপাটি নিয়ে আমি এখন বাড়ী ঢুকি কোন মুখে? বাড়ীতে পা দিলে বাবা অমনি জিজ্ঞেস করবে, ভালো খাবার-দাবার

কিছু আনলাম কিনা। ওরা মাত্র তু'খানা রুটি দিল! কিন্তু আমি কি করব? আমার কি দোষ? খাবার আনতে সোহিনী যায় নি কেন, বাবা নিশ্চয় প্রশ্ন করবে। তা'হলে মন্দিরের ঘটনাটা বাবাকে বলব না কি? বাবা শুনলে তো রেগে আগুন হয়ে উঠবে।'

একদিনের কথা ওর মনে পড়ল। ও তখন ছোট। পল্টনের এক সিপাই নির্জন একস্থানে একা পেয়ে ওর পিছু ধাওয়া করেছিল। বাড়ী ফিরে বাবাকে বলে দিয়েছিল সিপাই-এর কীর্তি। বাবার তখন কি রাগ ওর ওপর। সেদিন খুব ক'রে ওকেই বকেছিল। বাবা তো সব সময় পরের হয়েই কথা কইবে। ভুলেও কস্মিনকালে নিজেদের দিকে তাকাবে না। বামুন ব্যাটার কথা তার কানে তুলি কি ক'রে? কিছুতেই বুড়ো এটা বিশ্বাস করবে না। আর রাস্তার সেই ছোঁয়াছুয়ির কথাটা বললে হয়ত তেলে-বেগুনে একেবারে জ্বলে উঠবে। বলে উঠবে: 'একদিন তো মাত্র নিজে কাজে যেতে পারিনি, তোদের পাঠালাম, প্রথম দিনেই কিনা তোরা রাস্তায় ঝগড়া বাঁধিয়ে বসলি?' বাবা ঠিক এই কথা বলবে আর চেঁচাবে: 'কাজকর্ম তোরা শিখবি কবে রে?' তার চাইতে বরং একটা মিথ্যা কথা বলাই ভালো। কিন্তু সোহিনী খাবার কেন আনতে যায়নি, বাবা কি ওকে জিজ্ঞেস না ক'রে ছেড়েছে? এত সকাল সকাল কেন সে বাড়ী ফিরেছে, জানতে চেয়েছে নিশ্চয়ই বাবা। তাকে কিছু না বলাই ভালো। কিন্তু বাবা কি প্রশ্ন না ক'রে ছাড়বে? যাক্, করুকগে যাক্, যা হয় হবে।' মন থেকে সব দ্বিধা-সংকোচ আর দ্বন্দ্বের গুরুভার ঝেড়ে ফেলে দিল বখা। মুখ তুলে তাকাল আবার আকাশের দিকে। দল ছাড়া একটা শকুন পাক দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে শূন্যে। কয়েক খণ্ড মেঘকে কে যেন সেঁটে দিয়েছে আকাশের গায়ে।

আপন মনে নানান কথা ভাবতে ভাবতে বখা কখন যে বাড়ী এসে পৌছল নিজেই টের পায় নি। ও এসে দেখল, বাড়ীর সবাই বাইরে বসে বসে রোদ পোহাচ্ছে। ধাঙড়দের বস্তির রাস্তা-ঘাটে সরকারী আলোর কোনো

বালাই নেই। গোটা রাত্রিটা ধোঁয়াচ্ছন্ন, ভিজে স্যাঁতসেঁতে, ঘিঞ্জি খুপরির চাকৃচাক্ জমাট অন্ধকারের মধ্যে ওদের কাটিয়ে দিতে হয়। দিনের বেলা খোলা মেলা জায়গায় ছুটে এসে ওরা রাত্রির নিষ্প্রদীপ অন্ধকারে বাস করার জের সুদে আসলে আদায় ক'রে নেয়। অনেকেই নিজেদের দড়ির খাটিয়াগুলো বাইরে টেনে এনে তার ওপর গায়ে দেবার মোটা চটের কম্বলগুলো পেতে বসে থাকে। কিন্তু যত কষ্ট এদের গ্রীষ্মকালে। শীতকালে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা রোদে বেরিয়ে আসে। বাইরে বসে থাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

ঘরের বাইরে বারান্দায় এক জায়গায় একখানি হেঁসেলের মত ক'রে নিয়েছিল সোহিনীর মা। ওদের হেঁসেলটা জাত হিন্দুদের রান্নাঘরের মত নয়। ছোঁয়াছুঁয়ির অত কড়া বিচার-আচার ওদের নেই। না আছে তার প্রাচীরের ঘের; না আছে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের বালাই। সোহিনী তবু মা'র হেঁসেলখানা আগলে থাকে। উনুনের পাশেই পর পর দু'খণ্ড ঝাড়ু রোজ রাখা হয় খাড়া ক'রে। তার পাশে নোংরা ময়লা সরাবার একটা খালি ঝুড়ি। দু'টো মাটির কলসী, একটা হাঁড়ি, আর সস্তা এনামেলের একটা মগ রয়েছে ছড়ানো। সব কটা বাসনই মাটির। নীচে কালি জমে পুরু হয়ে উঠেছে। মা মারা যাবার পর থেকে একদিনও বাসন ক'টা আর মাজা হয় নি। সোহিনী এখনো ছোট। ঘরসংসারের অভিজ্ঞতা কোথায় তার? তাছাড়া বাইরের কাজকর্ম নিয়ে তাকে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হয়। হাত দু'টি থাকে জোড়া। ঘর-সংসারের দিকে অত নজর দেবার সময়ই বা কোথায়। শুধু তাই নয়, জলেরও তো টানাটানি। ওরা ভাঙ্গি; সারাদিন নোংরা কাজকর্ম নিয়ে থাকলেও ঘর ধোয়া-মোছার জন্য এক কলসী অতিরিক্ত জলও ওদের মিলবে না।

'বৃথাটা গেল কোথায়?' বোনের হাতে খাবারের পুঁটলিটা তুলে দিয়ে বখা শুধায়।

সোহিনী চুপ ক'রে রইল। লখা জবাব দিল :

'হতচ্ছাড়া খাবার আনতে গেছে পল্টনের সেই লঙ্গরখানা থেকে।' খাটিয়াটা হেঁসেলের কাছে টেনে এনে বুড়ো তার ওপর চেপে বসেছিল। গড়গড় শব্দে হুঁকোটায় তামাক টানছিল আর খক্-খক্ ক'রে কাশছিল। বেশ ফিট্‌ফাট্ দেখাচ্ছিল তাকে। লোম-তোলা ছোট চিমটেখানা দিয়ে এতক্ষণ বসে বসে বুঝি চিবুকের অবাঞ্ছিত লোম কটা উপড়ে ফেলেছিল। চিমটেটা আর রঙ-করা একখানা ছোট দেশী আয়না তার বাবা সব সময় বালিশের তলায় রেখে দেয়। সকালটা বোধ হয় বুড়োর ভালই কেটেছে। চোখে-মুখে কেমন একটা প্রশান্ত ভাব তার।

হ্যাঁরে, ভালো দেখে খাবার-টাবার পেলি কিছু?' বখাকে বুড়ো জিজ্ঞেস করে : 'একটু চাট্‌নি, ভালো ভালো একটু তরিতরকারী মুখে দিতে বড় ইচ্ছে করে।'

'মাত্র খান দুই চাপাটি তো পেলাম।'

'নচ্ছার বেটা, জানি তুই কোনো কাজের না!' বিড়বিড় ক'রে রাগে আশা-হত বৃদ্ধ বলে ওঠে। 'ঐ হতচ্ছাড়া হারামজাদাটা লঙ্গরখানা থেকে ভাল খাবার কিছু আনল কিনা দেখ দেখি!'

ভালো খাবারের কথা মনে হতেই লখা জমাদারের জিভে জল এসে যায়। মনে পড়ে শহরের লালাদের বিয়ে বাড়ীর সেই বিপুল ভুরীভোজনের কথাটা। বাবুদের পাতের রাশি রাশি উচ্ছিষ্ট লুচি, মোণ্ডা, চিংড়ি-কাট্‌লেট, নানান্ তরিতরকারী, অম্বল, পায়েস, মিষ্টির ছড়াছড়ি। রসুই থেকে ওদের জন্যে আলাদা খাবারের ব্যবস্থাও হয়েছিল। অমন দিন কি লখা কখনও ভুলতে পারে? বাবুদের বাড়ীতে কাজ করতে এসে বাড়ীর মেয়েরা বিয়ের উপযোগী হয়ে উঠল কিনা দেখত সে। ওদের তাড়াতাড়ি সাদি দিয়ে দেবার জন্য গায়ে পড়ে বাড়ীর কর্তা আর গিন্নীদের বলতো সে। বুলাশা শহরের অধিকাংশ মেয়ের বাল্য-বিবাহের জন্য লখাই

উদ্‌যোগী হয়ে যেত। মেয়ের বিয়ের সময় বাপ-মারা লখার কথা ভুলত না। ওকে ডেকে এনে একজোড়া কাপড় আর বড় রকমের একটা সিধের ব্যবস্থাও ক'রে দিত।

লখার আরও মনে পড়ে, যুদ্ধ জেতার পর লড়াই-ফেরতা পল্টনের ফৌজেরাও খানাপিনা ভোজের কি বিরাট ঘটাটাই না করেছিল! পল্টনের সব ধাঙড়দের সে হলো জমাদার। ধাঙড় মেথরদের মধ্যে উচ্ছিষ্ট পরিবেশনের ভারটা ছিল তার ওপর। নিজেই সবকিছু সে তদারক করেছিল। একটা কাঠের বাক্স ভরতি শুকনো মিষ্টি সরিয়ে এনে দিয়েছিল সে বখার মাকে। সারা বছর ধরে খেয়েও ফুরোতে পারে নি তারা।

'শহরের লোকজনদের আমি তেমন ভালো ক'রে চিনি না। অনেক বাড়ীতে খাবারের জন্য যাওয়াই হয়ে ওঠেনি।' বখা আপন অপটুতা স্বীকার ক'রে নিয়ে বলল। লখা তখনও আগেকার ভোজের স্বপ্নে মশগুল। ছেলের কথায় চটে বললে:

'সবটা এখনও চিনে নিস্‌নি কেন হারামজাদা? আমি চোখ বুজলে তোদের খাবার এনে দেবে কে শুনি?'

প্রথম দিন শহরে কাজ করতে গিয়ে কি অপমান আর নির্যাতনটাই না ওকে আজ ভোগ করতে হলো! আজীবন এই কাজ ক'রে যেতে হবে ভাবতে বখা আঁতকে ওঠে। চোখের ওপর ওর ভেসে ওঠে: এক ক্রুদ্ধ জনতা তাকে যেন তাড়া করছে, বেঁটে এক বামুন দু'হাত শূন্যে ছুঁড়ে যেন চিৎকার ক'রে বলছে, 'গেল-গেল, সব অপবিত্র হয়ে গেল!' চোখের ওপর আরও ভেসে ওঠে: নর্দমাটা ঝাট্‌ দেয়নি বলে ও-বাড়ীর সেই গিন্নীঠাকরুণ ওকে যেন বকছে, সেই যিনি দোতলা থেকে চাপাটিখানা ছুঁড়ে দিয়েছিল। 'না-না—!' ওর অন্তরাত্মা যেন তীব্র প্রতিবাদ ক'রে বলে: 'না—কখনো না! এর চাইতে বৃটিশ-ফৌজদের ব্যারাকে সাহেব-সুবোদের কমোডগুলো পরিষ্কার করা ঢের ভালো!'

'তোর আজ হলো কি রে?' ছেলের গম্ভীর থমথমে মুখ আর আরক্ত চোখ দু'টোর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল বুড়ো বাপ: হাঁপিয়ে পড়েছিস বুঝি?'

বাপের স্নেহমাখা কণ্ঠে বখার মনটা জুড়িয়ে যায়। আর একটু হ'লে ও বোধ হয় কেঁদেই ফেলত। নাট-মন্দিরের ঘটনাটা সব বলবে কি? বলার জন্য মনটা ঝুঁকে পড়ে। না, বলা ঠিক হবে না। তারপর ধীর কণ্ঠে বললে: 'না, কিছু হয়নি বাবা।' ছেলের কথার পুনরাবৃত্তি করল বখার বাপ, বললে: 'নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে; ঠিক কথাটা বলে ফেল।'

বখা নিজেকে আর চেপে রাখতে পারছিল না। বাপের সস্নেহ কণ্ঠে তার হৃদয়ের তন্ত্রীতে মীড়গুলো অনুরণিত হয়ে উঠল। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। মনে হলো, ও যেন এক্ষুণি ভেঙ্গে পড়বে। তুবড়ির মত সহসা ও ফেটে পড়ল: 'সকালবেলা ওরা আজ খামকা আমায় অপমান করল বাবা। রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছিলাম, এখন সময় একটা লোক আমায় ছুঁয়ে দিল। তারপর আমায় যাচ্ছেতাই ক'রে গালাগাল করলে। ধরে মারলও।' ক্রোধে অপমানে বখার গলাটা রুদ্ধ হয়ে এল।

'হ্যাঁরে বেটা, চলবার সময় তুই কি হাঁক ছেড়ে হুঁশিয়ার ক'রে চলিস্‌নি রে!'

বাপের কথা শুনে বখার পিত্ত জ্বলে উঠল। সত্যি কথা বললে তার বাপ যে এমন ধারা বলবে ও আগে থেকেই তা জানত। কথাটা বাবাকে না বললেই ভালো হতো।

ছেলের বিক্ষুব্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে লখার মনটা ব্যথায় টন্‌টন্‌ ক'রে ওঠে। মোলায়েম কণ্ঠে বলে:

'আরও একটু হুঁশিয়ার হ'য়ে চলাফেরা করতে পারিস্‌নে রে?'

'কিন্তু তাতে লাভ কি? বখা খেঁকিয়ে ওঠে: 'হাজার হাঁক-ডাক ছাড় না কেন, ওরা আমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করবেই। আমরা ওদের নোংরা ময়লা সব পরিষ্কার করি কিনা, তাই তো আমাদের ওরা পেয়ে বসে। ভাবে,

আমরা সব নীচু, ছোট জাত। মন্দিরের ঐ বামুন পণ্ডিতটা আজ করলে কি জান? সোহিনীর উপর বলাৎকার করতে চেষ্টা করেছিল। তারপর 'সব গেল—গেল, ছুঁয়ে দিল—ছুঁয়ে দিল' বলে চিৎকার সুরু ক'রে দিল। সেক্‌রা পাড়ার বড় বাড়ীখানার সেই গিন্নীঠাকরুণ দোতলার বারান্দা থেকে কিনা ছুঁড়ে দিল আমার খাবারটা! না, আমি আর ও-কাজ করতে পারব না বাবা। ও-কাজে আর যাব না কখনো।'

লখা বিচলিত হলো বৈকি। কিন্তু ওর প্রকাণ্ড গোঁফজোড়াটির আড়ালে একখানি অভিজ্ঞতা-পুষ্ট ক্ষুব্ধ অথর্ব হাসির রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। ব্যস্ত কণ্ঠে শুধাল:

'এ্যাঁ, পাণ্টা নিসনি তো তুই? মারধোর গালি-গালাজ তুই কিছু করিস্ নি তো বাবা?'

বাবুলোকদের কাছ থেকে চিরকাল সে গালি-গালাজ, লাথি-জুতো খেয়ে এসেছে মুখ বুজে। মাথা তুলে প্রতিবাদ করবার সাহস হয়নি একদিনের তরেও। মাথা পাগল ছেলেটা কি জানি আজ কি ক'রে বসলো! শঙ্কিত পিতা ছেলের হঠকারিতার ভয়ে তাই জিজ্ঞেস করে।

'না; তবে পাণ্টা আমিও একচোট্ নিলে পারতাম। কিন্তু নিই নি।' ব্যথিত কণ্ঠে উত্তর দেয় বখা।

'নারে বেটা, না,' বৃদ্ধ লখা ছেলেকে প্রবোধ দেয়: 'ওঁনারা বাবুলোক—ও'নাদের বিরুদ্ধে আমাদের কি আর কিছু করা সাজে! দারোগার কাছে যতই তুই নালিশ করনা গিয়ে ওঁদের একটা কথাতেই কিন্তু সব নালিশ নাকচ হয়ে যাবে। এই তো দেখেছি আমি জীবনভর! হবে না? ওঁরা যে আমাদের মুনিব লোক। মান্যিগণ্যি ক'রে চলতে হয় ওঁনাদের। যা হুকুম করবে তাই করতে হবে আমাদের। সবাই সমান না রে বেটা, সবাই সমান না। ওঁনাদের মধ্যেও দয়ালু ভালো লোকের অভাব নেই।'

লখা ছেলের কুপিত মুখের দিকে একবার তাকায় আড়চোখে। বাবু লোকেদের প্রতি ছেলের বিতৃষ্ণার কথা তার অজানা ছিল না। সান্ত্বনার সুরে বলে :

'তবে শোন্ বেটা : তুই যখন খুব ছোট ছিলিস, তোর তখন একবার ভারী ব্যামো হয়। এই দেখেই ভয়ে আমি ছুটলাম শহরের হেকিম ভগবান্ দাসের বাড়ীর পানে। হেকিম সাহেবের বাড়ীর সামনে গিয়ে আমি অনুনয় ক'রে ডাকাডাকি করতে লাগলাম। কেউ যদি আমার ডাকাডাকি শুনতো! হেকিম সাহেবের দাওয়াইখানার পাশ দিয়ে দেখলাম এক বাবু যাচ্ছেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দু'হাত জোড় ক'রে বললাম : বাবুজী, ও বাবুজী, হেকিমজীকে একবার আমার কথাটা গিয়ে বলুন না; ভগবান আপনার দয়া করবেন। সেই কখন থেকে চিৎকার করছি বাবুজী, কতজনকে সাধাসাধি করলাম। কেউই হেকিম সাহেবকে গিয়ে আমার কথাটা বলল না। আমার ছেলের ভারী ব্যারাম বাবুজী। কাল রাত থেকে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। দয়া ক'রে হেকিমজীকে একটু দাওয়াই দিতে বলুন না! "যা, যা, সরে যা—।' বাবুটি সহসা খেঁকিয়ে উঠলেন, "গায়ের ওপর এসে পড়বি নাকি তুই? সকালবেলা ফের স্নান করতে হবে তোর জন্য? আমরা সবাই সেই কখন থেকে বসে আছি, অফিসের তাড়াহুড়ো, হেকিমসাহেব আমাদের দেখে ওঠবার ফুরসুৎ পাচ্ছেন না। তা আমাদের না দেখে ওদের দেখতে হবে আগে! বেটা সারাদিন তুই করবি কি শুনি? যা, বসে থাকগে গিয়ে, না হয় অন্যদিন আসিস।"... এই ব'লে বাবুটি দাওয়াইখানার মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আমি কিন্তু তবু ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ওপাশ দিয়ে যাকে যেতে দেখলাম, তার পায়ে পড়ে কান্নাকাটি ক'রে বলতে লাগলাম, হেকিমসাহেবকে আমার কথাটা একবার জানাতে। কিন্তু ধাঙড়দের কথা কেই-বা শোনে? সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কোণের আস্তাকুড়টার পাশে ঘণ্টাখানেক ধরে আমি ঠায়

দাঁড়িয়ে রইলাম। একঝাঁক বিছে আমার সর্বাঙ্গে যেন হুল ফোটাতে লাগল। হেকিমজীর দাওয়াখানায় সারি সারি ওষুধের শিশিগুলো দেখে রক্ত-জল-করা ট্যাঁকের পয়সা ক'টা দিয়ে অসুস্থ ছেলেটার জন্য একফোঁটা ওষুধ কিনতে পারছি না, ভাবতেই আমার মনটা হু হু ক'রে উঠল। হেকিম সাহেবের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম বটে, আমার মনটা কিন্তু তোর কাছেই পড়েছিল। ভয় হতে লাগল, তুই বুঝি আর বাঁচবি নে। শেষবারের মত তোকে একবার দেখে যেতে কে যেন বলে উঠল আমার কানে কানে। অমনি ছুটলাম বাড়ির দিকে।...

'তোর মা তোকে কোলে নিয়ে বসেছিল। আমায় দেখে ছুটে এল। "হ্যাগা, দাওয়াই আনলে ?—"

বোখারের ঘোরে তুই তখন প্রলাপ বকছিলি। আমায় চিনতে পর্যন্ত পারলি নে। লোকজন সবাই বলাবলি করতে লাগল তোকে বাইরের উঠোনে এবার নিয়ে আসতে হবে। আমি হেকিম সাহেবের বাড়ির দিকে আবার ছুটলাম। তোর মা পেছন থেকে ডেকে বললে: "এখন আর ওষুধ কি হবে ?" আমি কিন্তু শুনলাম না। হেকিম সাহেবের বাড়ির দিকে দৌড়লাম। তাঁর বাড়ি এসে সরাসরি পর্দা ঠেলে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। পায়ের উপর আছড়ে পড়ে বললাম: ছেলেটার ধড়ে এখনো প্রাণ আছে হেকিমজী, আমার ছেলেটাকে বাঁচান। আমি আজীবন আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব। দয়া করুন, হেকিমজী, দয়া করুন! ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন।...

"ভাঙ্গি! ভাঙ্গি!—"

'দাওয়াইখানার মধ্যে হৈ হৈ পড়ে গেল। হেকিম সাহেবের পা দুটো আমায় জড়িয়ে ধরতে দেখে আশপাশের লোকগুলো যে-যেখানে পারে ছিটকে পড়তে লাগল। হেকিম সাহেবের মুখখানা শুকিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে তিনি চিৎকার ক'রে উঠলেন: "বেটা

চাড়াল, কার হুকুমে তুই এখানে ঢুকেছিস ? আমার দু'পা জড়িয়ে এদিকে তো খুব কান্নাকাটি হচ্ছে, আমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবি—অমুক হবি, তমুক হবি, বলি, আমার শ' শ' টাকার ওষুধ যে ছুঁয়ে নষ্ট ক'রে দিলি, বেটা তুই তার দাম দিবি ?..."

'হাউমাউ ক'রে আমি তবু কাঁদতে লাগলাম। বললাম, জ্ঞান ছিল না মহারাজ, ভুলে গেছলাম সব। আমার দু'গালে দু'জুতি মারুন। আপনি মহৎ ব্যক্তি, মহারাজ। গরিবের মা-বাপ। আমি কি আপনার ওষুধের দাম দিতে পারি ? যা হুকুম করবেন, তাই করব, মহারাজ। ছেলেটা মরো-মরো—বাঁচবে না হয়ত। দয়া ক'রে একবার পায়ের ধুলো দিয়ে যান·· একটু দাওয়াই দিয়ে যান মহারাজ ! ··

'হেকিমজী সবেগে মাথা নাড়লেন। চিৎকার ক'রে বলে উঠলেন : "হু" ! যা হুকুম করবেন, তাই করব ! বলি হারামজাদা, হন্তদন্ত হয়ে দাওয়াইখানার মধ্যে ঢুকে পড়লেই কি তোর ওষুধ মিলবে ভেবেছিস ?" ··

'না না সরকার, বাইরে অনেকক্ষণ ধরেই আমি ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওপাশ দিয়ে যারা আসছিল, তাদের প্রত্যেকের পায়ে পড়ে কান্নাকাটি ক'রে বলছিলাম : হুজুরকে একবার খবরটা দিও গো, আমার ছেলের ভারি ব্যামো। কিন্তু সরকার, কেউ আমার দিকে একবার ফিরেও তাকালে না ! এতটুকু দয়া করলে না ! ছেলেটাকে বাঁচান হুজুর, সারারাত ওকে আমি কোলে ক'রে বেড়িয়েছি ! ভেবেছিলাম, রাত পোহালেই আপনার কাছে ছুটে এসে একটু দাওয়াই নিয়ে যাবো। রাত দুপুরে এলে কে আমার ডাক শুনে দরজা খুলে দিত বলুন ?···

'হেকিমজীর দিলটা বুঝি গ'লে গেল। কাগজ-পেন্সিল নিয়ে খসখস ক'রে তিনি ব্যবস্থাপত্র লিখে চলছিলেন। ঠিক এমনি সময় তোর চাচা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে চিৎকার ক'রে উঠল :

' "লখা ও লখা : ছেলেটা যে মরে গেল রে !..."

'তাই শুনে আমি অমনি ছুটে বেরিয়ে এলাম। হেকিমজীর কলমটাও দেখলাম সহসা থেমে গেল। বাড়ি এসে দেখি তোর অবস্থা তখন ভারী খারাপ। তোকে সবাই বাইরের উঠোনে নিয়ে এসেছে। আর তোর মা তখন মাথা কুটে কাঁদছে।...

'একটু পরেই বাইরের দরজায় কে যেন এসে ঘা দিল। শোন রে বেটা,—তোর চাচা বাইরে এসে দেখে কি, হেকিমজী স্বয়ং এসে হাজির—হুজুর নিজে এসেই পায়ের ধুলো দিয়েছেন আমাদের বাড়িতে! হেকিমজী সত্যি ভারী ভালো লোক। তিনি তোর নাড়ী টিপে দেখলেন। যমের বাড়ি থেকে তোকে সেবার তিনিই তো ফিরিয়ে আনলেন।'

'তিনি তো আমাকে জানেও মেরে ফেলতে পারতেন!' বখা টিপ্পনী কাটে।

'না রে, না।' ওঁরা সত্যি আচ্ছা আদমী – দয়া-মায়ার শরীর ওঁদের। আমরা জানিনে কিনা, ওঁদের শাস্ত্রে যে বারণ আছে, তাই তো ওঁরা আমাদের ছোঁন না—আমাদের ছায়া মাড়ান না।'

নিয়তির বিধানকে নির্বিবাদে মাথা পেতে নেওয়া, আর নিজেকে চিরকাল খাটো ক'রে দেখা, নিজের এই জন্মগত পঙ্গু দুর্বলতা সম্পর্কে বখা আজও সচেতন হয়ে উঠল না। এই দীর্ঘ ফিরিস্তির কোথাও তা প্রকাশ পেলো না। প্রতিবারই সে মনকে চোখ ঠেরে এসেছে আত্মপ্রবঞ্চনা ক'রে।

বখা কিন্তু বিচলিত হয়ে ওঠে। ওর নিজের অমন একটা সাংঘাতিক অসুখের কথা বাপের মুখে বার বার উচ্চারিত হাতে শুনে নিজের প্রতি কেমন যেন করুণা জাগে। চোখ ফেটে জল এসে পড়ে। আত্মসংবরণ করতে বেগ পেতে হয়।

'হতচ্ছাড়া বখাটা কোথাও ঠিক খেলায় মেতে গেছে।' কথার মোড় ফিরিয়ে বুড়ো বকবক করতে থাকে: 'তোরা যখন খুশি খাস, আমি আর পারছি নে। কই রে সোহিনী, দু'একখানা রুটি দিবি তো খেয়ে নি।'

'তরি-তরকারি কিছু নেই কিন্তু,' সোহিনী বলে : সকালবেলাকার খানিকটা চা আছে বাবা। দেব, রুটির সঙ্গে ভিজিয়ে খেতে পারবে ?'

'যা হয় পোড়া বাপু, খিদে আর সয় না।' বুড়ো এক গেঁয়ো ছড়া কেটে বিড়বিড় করে ওঠে। সোহিনী চা-টা গরম করে। রখা জলের কলসীটার কাছে গিয়ে বসল উবু হয়ে। টিনের মগ থেকে খানিকটা জল নিয়ে হাত ও মুখখানা একবার ধুয়ে নিল। বাপের মুখে খাবারের কথা শুনে ওর নিজেরও যেন খুব খিদে পেয়ে গেল।

রখার এবার টিকির সন্ধান মিলল। নেড়া মাথা, তার উপর এক হাঁড়ি খাবার বসিয়ে আর-এক হাতে একটা প্যান ঝুলিয়ে রখার পায়ের মস্ত বড়ো এক-জোড়া ফিতেহীন বিবর্ণ মিলিটারী বুট পায়ে দিয়ে সশব্দে একরাশ ধুলো উড়োতে উড়োতে দেখা গেল বাড়ি ফিরতে। গায়ে একটা ছেঁড়া ফ্ল্যানেলের শার্ট। জামার হাতা দুটোয় নাক ঝেড়ে নোংরা কদর্য ক'রে রেখেছে সে। ঢিলে জামাটা হাঁটুর ওপর লেপটে প'ড়ে প্রতি পদে পদে চলার বাধা সৃষ্টি করছে। মুখখানা ক্লান্ত, বিষণ্ণ। দুই কোলে বেয়ে থুতু প'ড়ে পুরু হয়ে উঠেছে। ভনভন ক'রে মাছি উড়ছে তার ওপর। নোংরা মুখখানাকে আরো বিশ্রী ক'রে রেখেছে ছোটোখাটো চটুল চোখ দুটি, আর অপ্রশস্ত কপালটি। বড় বড় কান দুটোর উপর রোদ প'ড়ে চিকচিক করছে। চোখ দুটোই যা ওর খুদে শয়তানী বুদ্ধির পরিচয় দেয়। ঘিঞ্জি অছুত পল্লীর রখাই হলো খাঁটি প্রতিনিধি। অভিশপ্ত অবজ্ঞাত স্যাঁতসেঁতে, যেখানে এখন আলো নেই, বাতাস নেই, একফোঁটা জল বা নর্দমার কোন বালাই নেই ; শহরের শতশত লোক যেখানে এসে ত্যাগ ক'রে যায় পুরীষ, সেই সরকারী টাট্টিখানার আশেপাশে যারা প'ড়ে থাকে মাথা গুঁজে, বুক ভরে যারা দম নেয় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নিজেদের পুরীষের উৎকট দুর্গন্ধময় বাতাস ; দিনেও যেখানে রাত্রির আঁধার আর রাত্রিতে যেখানে চাক চাক পুঞ্জীভূত নিথর নীরন্ধ্র নিশা—অভিশপ্ত সেই পৃথিবীর নোংরা পূতিময় আবহাওয়ায় তারা লালিত-পালিত।

বড় হয়ে উঠেছে এই নোংরা পরিবেশে। অচ্ছুত পল্লীর আশেপাশের থমথমে আবহাওয়া তাকে গড়ে তুলেছে নিস্পৃহ, উদাসীন আর আলস্যপরায়ণ ক'রে। অটুট জীবনী-শক্তিতে ভরপুর সে। তবু তার প্রাণরস প্রতিদিন শুষে নিচ্ছে ম্যালেরিয়ার করাল জিহ্বা। প্রাণে একেবারে না মরলেও দিন দিন সে প্রাণহীন, ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়ছিল। মাছি আর মশাগুলো যেন দোস্তি পাতিয়ে নিয়েছে ছোটবেলা থেকে তার সঙ্গে।

'এতক্ষণে ফিরলি বুঝি ?' রখা চিৎকার ক'রে উঠল।

দাদার কথার কোন জবাব দিল না রখা। রান্নাঘরে যেখানে সোহিনী বসেছিল, এগিয়ে গেল সেদিকে। মাথার খাবারের চাঙারিটা বোনের সামনে সশব্দে নামিয়ে দিয়ে নিজেও সে মেজের উপর থেবড়ে বসে পড়ে। তারপর খাবলা খাবলা চাঙারি থেকে খাবার তুলে খেতে থাকে। গালের একদিকটা তার ফুলে ফুলে উঠছে। খাচ্ছে যেন পেটুকের মতো।

'অন্তত হাতটা একবার ধুয়ে নে জংলী কোথাকার!' যে হাতে খাচ্ছিল সে-হাত দিয়েই রখাকে নাক ঝাড়তে দেখে রখা বিরক্ত হয়ে বলে।

'নিজের চরকায় নিজে তেল দাওগে।' রখাও তিরিক্ষি হয়ে জবাব দিল সমান গলায়। সে জানে খাটিয়ার উপর সশরীরে বাবা বসে আছে। তাকে ছেড়ে বাপ কোনোদিন রখার হয়ে কথা কইতে আসবে না। তার প্রতিই যে বাপের টান বেশী, তার জানতে বাকি নেই।

'আয়নার সামনে গিয়ে নিজের চেহারাখানা একবার দেখে আয়গে যা!' রখাও জবাব দেয় গলা চড়িয়ে।

'তোরা আবার সবাই ওর পিছু লাগলি কেন?' লখা বাধা দেয়: 'খালি আজকের মতো ঝগড়াঝাঁটিটা না ক'রে থাকতে পারিস নে?'

'এস দাদা, রুটি খাও।' সোহিনী সস্নেহে বলে উঠল।

একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রখা তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সোহিনীর কাছে গিয়ে বসে খাবারের চাঙারির মধ্যে ডান হাতখানা ঢুকিয়ে দিল।

দেখল একগাদা খাবার আর খানকয়েক ছেঁড়া ও আস্ত চাপাটি রয়েছে চাঙারিটার ভেতর। একটা হাঁড়িতে খানিকটা ডাল-তরকারিও আছে।

এঁটো হাতে খাবারের চাঙারিটা থেকে ওরা সবাই খেতে স্বরু করল। বার বার নোংরা এঁটো হাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে রথার খাওয়ার ধরন দেখে বখা বিরক্তিতে নাক সিঁটকোয়। পেছন ফিরে বসল ও। খাবারের চাঙারির মধ্যে অর্ধভুক্ত এক টুকরো ভিজে চটচটে রুটির উপর হাত পড়তেই হাতখানা সর্পপৃষ্ঠের মত তৎক্ষণাৎ ও সরিয়ে নিল। চোখের উপর তার ভেসে উঠল : পাতের এঁটোকুটো থালায় নিয়ে কোন সেপাই এসেছিল আঁচাতে। রথাকে দেখতে পেয়েই বাসন ধোয়া এঁটোকুটোগুলো তার চাঙারিতে ঢেলে দেয়।···ছবিটা ওর চোখের উপর ভেসে উঠতেই গা-টা ঘিনঘিন ক'রে উঠল। মনে হলো এখুনি বুঝি পেটের সবকিছু বমি হয়ে উঠে আসবে। হাতের রুটিটা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়াল।

'কি রে খেলিনে, তোর না খুব খিদে পেয়েছিল?' ছেলেকে সহসা উঠে পড়তে দেখে লখা প্রশ্ন করল।

নীচু হয়ে বখা মগ থেকে জল নিয়ে হাত ধুতে লাগল। বাপের প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। কি জবাবই বা দেবে ও? খাবার দেখে গা ঘিনঘিন করছে : বললেই কি আর ওরা বিশ্বাস করবে? তবু ওজর একটা ও খুঁজে বললে ;

'রামচরণদের বাড়িতে আজ যে আমার নেমন্তন্ন। ওর বোনের আজ সাদি! না গেলে ভয়ানক রাগ করবে।'

অমন নির্জলা মিথ্যাটা বলতে ওর নিজের কানেও কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকছিল। রামচরণের বোনের সাদিতে যাচ্ছে কেন ও, নিজেও বুঝে উঠতে পারলো না। কেউ ওকে নেমন্তন্ন করে নি। গুলাব জন্মেও কোনদিন করবে না; যা কুঁদুলে, ছেলেকে বিগড়ে দিল বলে বখাকে হামেশা গালমন্দ করে সে। রামচরণও ওকে নিমন্ত্রণ করে নি। আর তার বোনের তো

কথাই ওঠে না। বছর দশেকের পর থেকে রীতিমত 'বড়' হয়ে সে তো আর ওর সঙ্গে কথাই বলে নি। তবু যাচ্ছে কেন ও? গায়ে প'ড়ে খামকা বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার কিইবা দরকার? ··

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলেই যেন বেঁচে যায়। রামচরণদের বাড়ি যাচ্ছে কেন ও? শেষবারের মতো তার বোনকে দেখে আসতে বুঝি?

নিজেকেই প্রশ্ন করে বখা। রামচরণের বোনের কচি মুখখানি ভেসে ওঠে ওর চোখের উপর। ন্যাড়া মাথা ছোট্ট একটা মেয়ে: গায়ে লাল টুকটুকে রঙচঙে জামা। তার উপর শাদা ফুল-তোলা-ধুপীদের জামা যেমন হয়ে থাকে। দূর থেকে ওকে দেখলে রাস্তার বানর-নাচিয়েদের খুদে বানর বলেই ভুল হয়। ওরই তখন কি বা বয়েস। বড় জোর বছর আষ্টেক হবে; মাথায় জরীর কাজ করা এক টুপি পরে ঘুরে বেড়াত ও তখন। জরীর সেই টুপিটা এক মহাজনদের বাড়ি থেকে চেয়ে এনেছিল ওর বাপ। মহাজন-বাড়ির ছেলে-পিলেদের পরিত্যক্ত জামা-কাপড়ে ওদের ভাইবোন তিনজনের সারা বছরের কাপড়-জামার অভাব বেশ মিটে যেত। বখার মনে পড়ে রামচরণ আর ছোটার সঙ্গে পল্টনে খেলতে খেলতে অনেক সময় ওরা ফিরে আসত। সবাই তখন গিয়ে 'বৌ বৌ' খেলত। রামচরণের ছোট বোনটি রঙচঙে এক ফ্রক পরতো বলে খেলাঘরে ওকেই বৌ সাজতে হতো। আর বখার মাথায় সর্বদা জরীর টুপি থাকত বলে ওকে সাজতে হতো বর। বস্তির অপর ছেলেরা কনে বা বরযাত্রী সাজতো কোন-না-কোন পক্ষের।...বখার আরও মনে পড়ে, নেড়া মাথা পুঁচকে মেয়েটার বর সাজতো বলে ছোটা ওকে কত ঠাট্টাই না করত। রামচরণের বোনটাকে দেখে ওরও অনেক সময় হাসি পেতো। তবু ছোটার কথা শুনে ও চটে উঠত হাড়ে-হাড়ে। রামচরণের বোনের পক্ষ নিয়ে কতোদিন না ও ঝগড়া করেছে নিজের বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে। সেদিনকার সেই নেড়া-মাথা

পুঁচকে মেয়েটা মাথায় আজ বড় হয়ে উঠেছে। ঢলঢলে গৌরবরণ মুখখানা ; মাথার কালো কুচকুচে একরাশ চুল। লাবণ্যে আজ সে কিশোরী। ওর সঙ্গে বর কনে খেলতে এখনো ওর ইচ্ছে করে না এমন নয়। কিন্তু মেয়েটা যা লাজুক ; যা মুখচোরা। তার দিকে একবার তাকাতে পর্যন্তও ওর সাহস হয় না। তবু তার কথা মনে পড়লে বুকখানা ওর নেচে ওঠে। হৃদয়ের মীড়গুলি অনুরণিত হতে থাকে। চৌদ্দ বছরে এখন সে পড়েছে। একত্রিশ নম্বর পাঞ্জাবী পল্টনের এক ধুপি-ছোকরার সঙ্গে আজ তার সাদি হবে। গত এক-বছর ধরে এই খবরটা রোজই ও শুনে আসছে। তাদের ভাঙ্গি পাড়ায় এটাও রটে গেছে যে গুলাব মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে শ'দুই টাকা বরপক্ষ থেকে আদায় ক'রে নিয়েছে। ছোটা এসে কানে কানে খবরটা দিয়ে গিয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যেবেলা খবরটা প্রথম শুনে ও কিন্তু ভয়ানক দমে গিয়েছিল। বুক ভেঙে ওর কান্না এসেছিল। অনেক সময় কাজ করতে করতে দুর্বল মুহূর্তে চোখের উপর ওর ভেসে উঠত মেয়েটির মুখখানি। সর্বাঙ্গ ওর যেন পুলকিত হয়ে উঠত। ঘুমের ঘোরেও অনেক সময় বখা রামচরণেব বোনের নাম ধরে চিৎকার ক'রে উঠত। স্বপ্ন দেখত, ও যেন তার তন্বী দেহলতাকে আপনার বলিষ্ঠ দুই বাহুপাশে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে। তন্দ্রার ঘোর কেটে যেতেই ধড়ফড় ক'রে ও উঠে বসত। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে যেত।

বখা রামচরণদের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায় মন্থর পদে। স্মৃতির ভাণ্ডার উপুড় ক'রে ফেলে-আসা কত কথা আজ তার মনে পড়ে। মনে পড়ে : কেরোসিন তেলের একটা পুরনো বোতল নিয়ে সেদিনও ও দোকানে যাচ্ছিল তেল আনতে। পথে দেখা হয়ে গেল বখার সঙ্গে। ওকে দেখেই প্রীতিমুগ্ধ চোখ দুটি ওর নেচে উঠেছিল আনন্দে। চটুল হেসে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল মেয়েটি। আরও একদিনের কথা ওর মনে পড়ে। ভোরের আবছা তরল অন্ধকারে অচ্ছুত পল্লীর গুটিকয়েক তরুণীর সঙ্গে রামচরণের বোনও নদী

থেকে গা ধুয়ে ঘরে ফিরছিল। সিক্ত বসনখানা সর্বাঙ্গে তার লেপ্টে গেছে। বখা তখন ঘাড় গুঁজে টাট্টি সাফ ক'রে চলছিল। ওকে দেখে বুকের মধ্যে ওর আনন্দের শিহরণ খেলে গেল। ওর বিবসনা নগ্ন মূর্তিটি যেন চোখের উপর ভেসে ওঠে। ভয়ানক তার ইচ্ছে হয়ঃ ওর উলঙ্গ তন্বী দেহখানাকে আপনার বলিষ্ঠ সুবিশাল দুটি বাহু আর হাঁটুর কীলকের মধ্যে আবদ্ধ ক'রে দলিত মথিত নিষ্পেষিত ক'রে ফেলতে। জোর ক'রে মিটিয়ে নিতে চায় যেন আপনার লালসার আশ।…আঁতকে উঠে বখা সহসা দু'হাতের মধ্যে আপনার মুখ ঢাকে। ছিঃ, নোংরা এসব ভাবছে কি? সৎ, সাচ্চা ছোকরা বলেই ওকে সবাই জানে। অচ্ছুত পল্লীতে ওর সে-সুনাম আজ বুঝি জাহান্নামে যেতে বসেছে। মন থেকে ও অসুস্থ চিন্তাগুলো উপড়ে ফেলতে চেষ্টা করল।··

'শি-ও শি-ও – শি!'

বখা ধুপী পল্লীতে এসে পড়ল এক সময়। জনকয়েক ধোপা নদীর এক হাঁটু জলে নেমে এক খণ্ড পাথরের উপর ঝুঁকে পড়ে কোমর বেঁকিয়ে সশব্দে কাপড় কাচছে আর বুঝি কাপড় জামাগুলোর দফা রফা করছে। বখা থমকে দাঁড়াল। তালে তালে কাপড় কাচার পাট দেখতে ওর ভাল লাগে। ছোটবেলায় ওর একবার ধুপী হবার বাসনাও গিয়েছিল। কিন্তু গুলাবের জারজ বেটা রামচরণই ওর সে-বাসনার মূলে কুঠার হেনে শুনিয়ে দিয়েছিলঃ 'দেখ বখা, তোর সঙ্গে আমরা হেসে-খেলে বেড়াই বটে—খেলাধুলোও করি; কিন্তু জানিস, আমরা হলাম জাত-হিন্দু, আর তুই হলি ধাঙ্গড়। তোর ছায়া পর্যন্ত আমাদের মাড়াতে নেই।' বখা তখন নেহাত ছোটই ছিল। ধোপার ছেলের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ইঙ্গিতের সম্যক তাৎপর্য তখনও বুঝে উঠতে পারে নি। আজ হলে হয়ত ঠাস ক'রে মেরেই বসত। ছোট লোকদের মধ্যেও যে অনেক-গুলো ধাপ আছে, আর তার—ধাঙ্গড়রা যে একেবারে নীচের তলার লোক—এখন আর তার জানতে বাকি নেই।

ধোপাদের কাপড় কাচার দিকে ও কিছুক্ষণ আপন মনে তাকিয়ে রইল। ওদের গাধাগুলো ছাড়া পেয়ে নদীর ধাবে চবে বেড়াচ্ছিল। ও তাদের পিছু নিল। রামচরণকে হয়ত পাওয়া যেতে পারে গাধাগুলোর সঙ্গে। ধোপারা বিকেলের রোদে কাচা কাপড় সব মেলে দিয়েছিল শুকোতে। বথা গিয়ে সেখানেও খুঁজে দেখল রামচরণকে। কিন্তু কোথাও পেল না। পাবেই বা কি ক'রে? আজ না তার বোনের সাদি! এমন দিনে কি সে আর বেরিয়েছে কোথাও? বা রে, সেবার তাব বাপ যখন মারা গেল, সে তো ওদেরই সঙ্গে ছিল, হাত-ছিপে মাছ ধরছিল! তাকে তো আব তার বাপ জন্ম দেয় নি। কিন্তু এ আলাদা। আপন মায়ের পেটেরই বোন! তার বিয়েতে বাড়ি না থেকে কি পারে? ও ববং ওদের বাড়িই যাবে। সেই ভাল।

রামচরণের বাড়ির দিকে ও পা বাড়াল। কিন্তু এবাব ওর লজ্জা করতে লাগল। হাজার হোক বিয়ে-বাড়ি। একগাদা লোক গিজগিজ করছে ওখানে। রাজ্যসুদ্ধ সব ধোপারা নিশ্চয়ই সেজেগুজে এসে হাজির হয়েছে। গান করছে হয়ত নিজেদের দক্ষিণী ভাষায়। গায়ে পড়ে ও বিয়ে বাড়িতে যায় কি ক'রে? সত্যি ওর লজ্জা করতে লাগল। হাত-পাগুলো যেন অসাড় হয়ে গেছে। বিয়ে বাড়িতে গিয়ে রামচরণকে ও ডাকবে কি ক'রে?

পরক্ষণেই বথা ওব সর্ব দুর্বলতাকে ঝেড়ে মুছে ফেলল নিঃশব্দে। অচ্ছুতদের বস্তির একটা মোড় ফিরতেই ও রামচরণদের বাড়ির হাত বিশেক দূরে এসে পড়ল। সবিস্ময়ে দেখল কাঠের একটা খুঁটি ঠেস দিয়ে ছোটা কখন এসে রামচরণদের বাড়ির দাওয়ার উপর উপবিষ্ট নানান বয়সের স্ত্রী-পুরুষের দিকে তাকিয়ে আছে।

বথা খুঁটটার দিকে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ছোটার পাশে গিয়ে। ছোটা চমকে উঠে ফিরে দাঁড়াল। বন্ধুর একখানা হাত সস্নেহে চেপে ধরল। দু'জনেই তখন বিয়ে বাড়ির আনন্দ-মুখর সুবেশ অভ্যাগতদের দিকে

তাকিয়ে রইল ফ্যালফ্যাল ক'রে। রামচরণের বোনের কথা এক সময় মনে পড়তেই বুকটা বখার ঢিপঢিপ ক'রে উঠল। ঘেমে উঠল ও রীতিমত। ঠিক এসময় আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ঢাকের কাঠি বেজে উঠল ড্যাক্ ড়্যাড়্যাম্, সানাই ধরল র'। কান দুটো ঝালাপালা হয়ে ওঠে। তালা লাগবার উপক্রম।

'দাঁড়া, রামচরণকে আমি ডাকছি।' ছোটা এক গাল হেসে বলে উঠল।

না সাহেবী, না দিশী বিচিত্র এক পোষাক পরে রামচরণ তখন বসে লাড্ডু খাচ্ছিল। ছোটা আর বখাকে দেখতে পেয়ে চোখ ঠেরে কাছে ছুটে এল।

'হ্যা রে শালা, আমাদের গোটা কয়েক খেতে দে—।'

রামচরণ তার ইজেরের পকেট দুটো আর রুমালখানায় লাড্ডু বোঝাই করতে ভোলে নি। গুলাব তখন নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের পচাই আর লাড্ডু পরিবেশনে ব্যস্ত। রামচরণ মা'র দিকে আড়-চোখে একবার তাকাল। বলল :

'আরে চুপ কর শালা, মা দেখতে পাবে।'

গুলাবের শ্যেন দৃষ্টিকে কিন্তু এড়ানো গেল না। বাজখাঁই গলায় সে চিৎকার ক'রে উঠল :

'বলি হতচ্ছাড়া বেজন্মা, আজ না তোর বোনের সাদি? আজকেও তুই নোংরা ধাঙড়দের আর মুচিদের ওই ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে ঘুরে বেড়াবি টো-টো ক'রে? লজ্জা ক'রে না তোর?'

'বজ্জাত মাগী, চুপ কর তুই।' রামচরণও সমান গলায় খেঁকিয়ে উঠল, তারপর অচ্ছুত বস্তির উত্তর দিকের ঢিপিটার দিকে দৌড়ুতে লাগল। ছোটাও ছুটল রামচরণের পিছু পিছু। বখা অগত্যা তার ভারী দেহখানা নিয়ে চলল থপথপ ক'রে।

'দে ভাই দে, গোটা কয়েক লাড্ডু দে। সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি হাঁ ক'রে তোদের বাড়ির সামনে।' ছুটতে ছুটতে ছোটা বলল।

'পাহাড়ে পৌঁছেই দেব রে—। তোর আর বথার জন্যই তো এনেছি সব। এখন ছুটে আয় ভাই, নইলে মা এক্ষুণি এসে পড়বে।' রামচরণ আশ্বাস দিল ছোটাকে। তারপর বথার দিকে মুখ ক'রে বলে উঠল: 'ওই হাতি, শুনছিস, লাড্ডু খাবি তো আয় না ছুটে।'

বথার তবিয়তখানা আজ বিশেষ ভাল ছিল না। রামচরণের স্থূল পরিহাসে হাড়ে হাড়ে ও: চটে গেল। মুখে কিছু বলল না। নীরবে সঙ্গীদের অনুসরণ ক'রে চলল।

বুলাশা পাহাড়ের কোণ বেয়ে ঢালু যে পথটা নেমে এসেছে তা ধরে চলতে থাকে ও। দু'পাশের ঘাসের লম্বা লম্বা ডালগুলো দু'হাত বাড়িয়ে যেন পথ আগলে ধরে। ঝিরঝির ক'বে দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যেতে থাকে। বথার বুকখানা জুড়িয়ে যায়। অচ্ছুত পল্লীর নোংরা পরিবেশ আর মুখর কল-কোলাহল সব মুছে যায় ওর মন থেকে। থমকে দাঁড়ায় ও পথের উপর। চোখ তুলে তাকায় সামনে। চারদিকে থোকায় থোকায় শ্যামলশ্রীর অপূব সমারোহ। বুলাশা পাহাড়ের সবুজ বনানী তার অফুরন্ত সৌন্দর্য ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে যেন দাঁড়িয়ে আছে। ধ্যানমগ্ন বনস্পতিরা মৃদু-মন্দ হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছে এদিক-ওদিক। ঝলমল করছে রোদে। বথা অবাক হয়ে যায়। হারিয়ে ফেলে নিজেকে। আশপাশের গাছপালার ঝিরঝির খসখস পতপত শব্দ ও যেন কান পেতে শুনতে থাকে। হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে যেন বনস্পতিরা!...ভাগ্যিস রামচরণরা এগিয়ে গিয়েছিল অনেক দূর। নইলে বোধহয় আশেপাশেব এই শান্ত নিবিড় সমাহিত পরিবেশকে ভেঙ্গে খান খান করে দিত।

ওখানটায় ও পায়চারি করতে লাগল। প্রকৃতির সংগোপন মণি-কোঠায় পৌঁছে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ সম্ভোগ করতে ওর মন

চাইল না। ছেলেবেলাকার কথা ওর মনে পড়ে এখানে এলে। দলবল নিয়ে ছেলেবেলায় ওরা খেলতে আসত এই পাহাড়ে। ওখানকার ওই ঢিপিটার মাথায় একটা নিশান উড়িয়ে দিয়ে তাকে বানিয়ে তুলত নকল কেল্লা। তারপর কেল্লাটা অধিকার করবার জন্য তখন কঞ্চির তীর-ধনুক নিয়ে দুই পক্ষে তুমুল লড়াইয়ে মেতে যেত। অনেকের হাতে আবার রীতিমত খেলনা-পিস্তলও থাকত। সে-সময় কি মজার দিনই না গেছে! ও ছিল সবাইর সর্দার—'জান্‌রেল'—সেনাপতি।

আটাশ নম্বর শিখ পল্টনের ছোঁড়াদের সঙ্গে সেবারকার লড়াইএর কথাটা মনে প'ড়লে আজও ওর সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। মনটা ভরে ওঠে গর্বে। বাপস্! সে কি লড়াই। তবু শেষে ওরাই জিতে গিয়েছিল।... হায়, সে-সব দিন কি আর আছে? ছেলেবেলাকার ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়লেই বুকটা তার হু হু ক'রে ওঠে। কেমন যেন তার কান্না পায়! আজকাল খেলাধুলো করবার একটু ফুরসতও ও পায় না। একটু হকি খেলতে বেরুলেই বাপ অমনি ডাকা-ডাকি হাঁকা-হাঁকি শুরু ক'রে দেয়। বথা কেমন যেন মনমরা হয়ে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই ও মন থেকে ওসব চিন্তা মুছে ফেলে। তাকায় আশপাশের পরিপূর্ণ বনশ্রীর দিকে। ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে সযত্নে কে যেন ঘন ঘাসের একখানা গালিচা দিয়েছে বিছিয়ে। নানান রঙ-বেরঙের ফুল এখানে-ওখানে ফুটে আছে থোকায় থোকায়। কোন্ ফুলটার কি নাম, অতশত জানে না ও। ওর কাছে ফুল খালি ফুলই।...নীচে কিছু দূরে পাহাড়ী ঝরণার জল জমে জমে একটা ডোবার মত হয়েছে! চারদিকে তার লম্বা লম্বা ঘাস আর আগাছা গজিয়ে উঠেছে। দমকা হাওয়ায় তাড়া খেয়ে ওরা বার বার নুয়ে পড়ছে জলের উপর। মনে হয় যেন ঝুঁকে পড়ে জল পান করছে। তৃষ্ণাতুর পথচারীরা ওপাশ দিয়ে যাবার সময় ডোবাটা থেকে জল খেয়ে যায় সবাই।

প্রাণভরে ও দম নিল। এক ঝাঁক চড়ুই পাখী কিচিরমিচির ক'রে উড়ে বেড়াচ্ছে আশেপাশে। বুকটা ওর অনেকটা চড়ুই পাখীর মত হাল্কা হয়ে গেল। নীচের ডোবাটার দিকে এগিয়ে চলল ও। পথের দুই পাশে কত ফুল ফুটে আছে। অমন সুন্দর দৃশ্যটি কিন্তু ওর মনে একটুও রেখাপাত করল না। মূঢ় অবোধ শিশুর মত ওর চোখ এড়িয়ে গেল। প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার দুর্বার ঘূর্ণিপাকেই বিব্রত বিপন্ন বখা। কোন মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য বা শোভা ওর মনে ধাক্কা দিলেও তেমন ক'রে সাড়া দেয় না। দিতে পারেও না। যে সামাজিক পরিবেশ এবং দাসত্ব-শৃঙ্খলের গণ্ডীর মধ্যে বংশানুক্রমে ও বড়ো হয়ে উঠেছে, তাতে হাজার ইচ্ছে থাকলেও আর দশজনের মত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার অবকাশ কোথার ওর ! ··

নীচের পুকুরের পাড়ে নেমে এল বখা। অসংখ্য গাছপালা বহু শাখা-পল্লব বিস্তার ক'রে পুষ্করিণীটিকে ছায়াশীতল ক'রে রেখেছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের আলো এসে ঠিকরে পড়েছে জলের উপর। দেখে মনে হয় বখার অশান্ত হৃদয়টার মত ছোট ছোট ঢেউগুলি রোদে নাচছে চিকচিক ক'রে। অফুরন্ত প্রাণ-বন্যায় চারিদিক উছলে উঠছে। হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে বখা সটান চিত হয়ে শুয়ে পড়ল পুকুরের পাড়ে।

একটু বুঝি তন্দ্রায় মত এসেছিল। হঠাৎ ঘোর কেটে গেল। দেখল ছোটা কখন এসে নাকে তার কুটো দিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে আর টেনে টেনে এক গাল হাসছে। বিকট শব্দে হেঁচে উঠল বখা। ধড়ফড় ক'রে উঠে বসল। বেরসিক ও নয়। বন্ধু-বান্ধবের একটু ঠাট্টা-ইয়ারকিতে চটে উঠল না। কিন্তু সকালবেলাকার পর পর অতগুলো ঘটনার পর থেকে মনটা আজ ওর তিতিয়ে উঠেছিল। বন্ধুর রহস্যটাকে তেমন ক'রে নিতে পারল না। তবু ফিক ক'রে হাসল একটু ও। ছোটার নজর এড়াল না। প্রশ্ন করল : 'কি রে শালা, তোর হয়েছে কি ?'

'কিছু না।' বখা জবাব দিল নিস্পৃহ কণ্ঠে: 'তোরা দু'জনে ছুটে এগিয়ে গেলি। আমি ধীরে ধীবে আসছিলুম রে—'

'তুই আমাদের খুঁজে দেখলি না কেন?'

'কাল রাত্রে ঘুমটা ভাল হয় নি ভাই, ভাবী ঘুম পাচ্ছিল। বেজায় ক্লান্তিও লাগছিল।'

'ঘুম হবে কি ক'বে? তুই ভদ্দর নোক হচ্ছিস কিনা, তাই তো লেপ গায়ে দিবি নে। বাপেব কথা শুনবি নে।' ছোটা টিপ্পনী কাটে। লেপ গায়ে দেওয়া নিয়ে বাপ-বেটাব কথা কাটাকাটিব ইতিহাসটুকু শুনে নিয়েছিল সে বখার কাছ থেকে।

'থাম রে শালা!' বখাও বলে উঠল: 'তুইও কম যাস নাকি? শালা সাহেব হয়েছে কিনা, টুপি আব ইজেবটি ঠিক চাই।'

সাহেব-সুবোদের বেশ-ভূষা আচার-ব্যবহার অনুকরণ করাব প্রাণান্তকব চেষ্টা করলেও নিজেদেব এই দুর্বলতা সম্পর্কে ওরা সর্বদা সচেতন হয়ে থাকত। ভদ্দর লোক বনে যাওয়া নিয়ে গুরুজনদেব এই পবিহাসটা নিজেদের মধ্যে হামেশা বলাবলি ক'রে বেড়াত।

প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবাব জন্য বখা বলে উঠল:

'হ্যাঁ রে, সেই লাড্ডুগুলো গেল কোথায় শুনি?'

'এই যে তোর ভাগ।' ভাঙ্গা-চোরা গোটা তিনকে লাড্ডু একখানা রুমালে ক'রে রামচরণ নিয়ে এসেছিল। লাড্ডুগুলো এগিয়ে দিল বখার দিকে।

'এদিকে একটা ছুঁড়ে দে—' বখা বলল।

'তুই নে না।' রামচরণ জবাব দিল।

বখা তবু ইতস্তত করতে লাগল। হাত গুটিয়ে বসে রইল। রামচরণ বকবক ক'রে বলে উঠল: 'কি রে, তুই নিজে নিতে পারছিস নে?'

না ভাই, তুই বরং ছুঁড়ে দে।' বিনীত কণ্ঠে বলল বখা।

রামচরণ আর ছোটা দু'জনেই রীতিমত তাজ্জব বনে গেল। বখাকে এভাবে কথা বলতে ইতিপূর্বে কোনদিন দেখে নি। রামচরণরা ধোপা। ছোটলোক অচ্ছুতদের মধ্যে ওরাই জাতে বড়। তারপর মুচির ছেলে ছোটারা। আর বখারা হলো সকলের নীচের ধাপের—একেবারে শেষ পঙক্তির। কিন্তু ওরা তিনজন ওসব জাতবিচার মানত না। হিন্দুদের ওসব ছোঁয়া-ছুঁয়ি ভেদা-ভেদি আর জল চলাচলের নিয়ম-কানুন নিয়ে নিজেদের মধ্যে কত ঠাট্টা-তামাশা ক'রে বেড়িয়েছে। তিনজনে মিলিমিশে কত মিঠাই-মণ্ডা খেয়েছে। বুলাশা ব্রিগেডের বিভিন্ন সৈন্যদলের ছেলে-পিলেদের টীমগুলোর সঙ্গে হকি ম্যাচ খেলতে গিয়ে বৎসরান্তে একবার ক'রে অন্তত কত সোডা-ওয়াটার না খেয়েছে ওরা কাড়াকাড়ি ক'রে।

'হ্যাঁ বে, হয়েছে কি তোর?' ছোটার কণ্ঠে গভীর উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে। সস্নেহে আবার প্রশ্ন করে:

'বল না ভাই, হয়েছে কি?'

'না রে ভাই, কিছু না।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বল; বন্ধু ইয়ারদের কাছে বলবি নে তো বলবি কার কাছে?' ছোটা পেড়াপীড়ি করতে থাকে।

বখা তখন সকালবেলাকার ঘটনাটি বলে গেল।

শহরের রাস্তা ধরে যাচ্ছিলুম ভাই, একটা লোকের গায়ে একটু ছোঁয়া লাগতেই লোকটা কিভাবেই না গালাগালি করলে। রাজ্যসুদ্ধ অতগুলো লোকের সামনে ধাঁই ক'রে মেরে পর্যন্ত বসল।'

'তুইও কয়েক ঘা বসিয়ে দিলি না কেন?' ছোটা রীতিমত রেগে বলে।

'শোন্ না, আরও বলছি।' বখা তখন নাট মন্দিরের পুরুতঠাকুরের কীর্তিটা বলে গেল: 'জানিস্, পুরুতঠাকুরটা মোহিনীর উপর বলাৎকার করতে গিয়ে অবশেষে ''ছুঁয়ে দিলে— ছুঁয়ে দিলে'' বলে চিৎকার ক'রে উঠল।'

'আচ্ছা তুই দাঁড়া, ও শালা বেজন্মা এর পর আসুক না কোনদিন আমাদের পাড়ায়। শালাকে দেখে নেবো।' রাগে অপমানে ছোটা ফেটে পড়ল।

'আরও শোন ভাই, আরও শোন!' এই বলে বখা তখন স্যাকরা পাড়ার সেই গিন্নীর কথাটা বলে গেল বাড়ির উপরতলা থেকে যে রুটি ছুঁড়ে দিয়েছিল তার উদ্দেশ্যে।

তাই নাকি,' ছোটার মনটা সহানুভূতিতে গলে গেল। বখার পিঠে একবার হাত বুলিয়ে দিয়ে সান্ত্বনার সুরে বলল: 'যাকগে ভাই, তুই কিছু মনে করিস নে! আমরা সব ছোটলোক—অচ্ছুত, কীই বা করতে পারি বল!' প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবাব জন্য তারপরে বললে:

'চল, হকি খেলিগে। ও শালা একবার আমাদের পাড়ায় এলে হয়। তখন এমন সাজা দেব, জীবনে আব কখনও ভুলবে না।'

'হ্যাঁ রে চল, এবার খেলতে যাই।' রামচরণও সায় দেয়।

হকির প্রসঙ্গ উঠতেই হাবিলদার চারৎ সিং-এর কথা মনে পড়ে যায় বখার। চারৎ সিং তাকে একখানা নতুন ষ্টিক দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বলেছিল ব্যারাক থেকে গিয়ে নিয়ে আসতে। বখা আটত্রিশ নম্বর ডোগরা পল্টনের ব্যারাকের দিকে পা বাড়ায়।

কারও কোন পাত্তা নেই; ফাঁকা খাঁ খাঁ কবছে ব্যারাকের প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণটা। কোয়ার্টার গার্ডটাও নেই; কে জানে কোথায় গেছে। রুদ্ধ অস্ত্রাগারের সামনে খালি দু'জন নির্বাক সান্ত্রী বারান্দার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। পাঁচিলের গায়ে এক জায়গায় ঝোলানো আছে একটা শোলার টুপি। একমাত্র টুপিটা ছাড়া সব কিছুই নির্জীব ব'লে মনে হয় বখার। ওই টুপিটাকে ঘিরে কত কাহিনীই না ছড়িয়ে আছে। কেউ কেউ বলে পল্টনে সাহেব লোকদের কর্তৃত্বের প্রতীক হলো ওই টুপিটা। কেউ বা বলে: পল্টনের কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী টুপিটা

ভুলে ফেলে গেছে। সাহেব আদমী; সামান্য একটা টুপি হারিয়ে গেলে কতটুকুই বা যায় আসে তাদের? টুপিটা আর ফিরে নিতে আসে নি। চুপিসারে অনেকে বলে বেড়ায়, আসলে ওই টুপিটা হলো এখানকার কোন উপরওয়ালা সাহেব কর্মচারীর। একবার এক সিপাইকে খামকা গুলী ক'রে বসেছিলো ব'লে সামরিক আদালতে তার বিচার হয়। কিন্তু সাহেব লোককে তো আর সাধারণ সিপাই-সান্ত্রীদের মত গারদে পাঠানো চলে না। তাই তার পরিবর্তে তার টুপি আর তরবারিখানাকেই গারদ করা হয়েছিল। সেই রাত্রিতেই কিন্তু সাহেবটি হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। কেউ কেউ কানাঘুষো ক'রে থাকে, পল্টনের বড় সাহেবের নাকি হাত ছিল এই ব্যাপারে। তিনিই নাকি তাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ ক'রে দিয়ে সাজার হাত থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন সান্ত্রীকে তুমি যদি জিজ্ঞেস কর, শুনতে পাবে: টুপিটা পল্টনের এক সাহেবের। সাহেব কুচকাওয়াজ করতে মাঠে গেছে! এক্ষুণি ফিরে এসে টুপিটা নিয়ে যাবে। আটত্রিশ নম্বর ডোগরা পল্টনের ছেলেছোকরাগুলো ছাড়া সাহেবের ঐ টুপিটা নিয়ে আর কারো কোন কৌতূহল ছিল না। ওদের মধ্যে একেবারে যারা ছোট ছিল, তারাই খালি সান্ত্রীর কথা বিশ্বাস ক'রে ভয়ে পালিয়ে যেত। সাহেব দেখলে ওরা ভূত দেখার মত ভয়ে কেঁপে উঠত। কি জানি কখন হাতের ছড়ি দিয়ে সপাৎ ক'রে মেরে বসে? ওদের মধ্যে আবার যারা একটু বয়সে বড়, তারা সান্ত্রীদের কথাগুলোকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিত। ভাবত, ছোট ছোট ছেলেপিলেদের হটিয়ে দেওয়ার জন্য এটা একটা ভাঁওতা মাত্র। কিন্তু সান্ত্রীরাই বা কেন তাদের কাছে অমন মিথ্যে ভাঁওতা দিত, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারত না। দেয়ালের গা থেকে টুপিটা পেড়ে নিয়ে নিজে কেন মাথায় দেয় না।...

দেয়ালের গায়ে ঝুলনো শোলার ঐ টুপিটাকে কেন্দ্র ক'রে অত খোশ-গল্পের প্রধান কারণ হলো আটত্রিশ নম্বর ডোগরা পল্টনের প্রত্যেকটি ছেলে

এ টুপিটার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। সবাই চায় কোট পাতলুন পরে মাথায় শোলার টুপি চড়িয়ে খাস সাহেব বনে যেতে। ওই টুপিটার প্রতি তাই ছিল ওদের বেজায় লোভ…বখারও অনেকদিন থেকে টুপিটা হাত করবার একান্ত ইচ্ছা ছিল। একটু বড় হয়ে ও যখন ব্যারাক ঘর ঝাঁট দিতে এল, ঝাঁট দেবার জন্য ও ওপাশটাই প্রথম বেছে নেয়। নানান ফন্দি আঁটত দেয়ালের গায়ে পেরেক থেকে কি ক'রে টুপিটা মেরে দেবে।

ওখানকার নন্-কমিশনড বাবুদের কিংবা সিপাই-সান্ত্রীদের সঙ্গে ভাব ক'রে টুপিটা ও হাত করতে চেষ্টা করেছিল। হাবিলদারটি তার বাপ লখা জমাদারকে নিশ্চয়ই চিনে থাকবে। ওকে বলে একবার দেখলে হয় না? যাক গে, টমিদের পুরনো পোষাক-পরিচ্ছদের দোকান থেকে অমন একটা টুপি কিনে নেওয়া যাবে'খন। বখা নিজের মনকে নিজে চোখ ঠারে। হ্যাঁ, ওখান থেকে কিনে নিলেই হবে। ভারি তো সামান্য একটা টুপি, কতদিন থেকে পড়ে আছে ওখানটায় কে জানে। একগাদা ধুলো আর ময়লা জমে কেমন রঙ-চটা বিশ্রী হয়ে গেছে।

তা ছাড়া শোলার টুপি পরে কেউ আবার হকি খেলতে যায় নাকি? আর যাই হোক, রামচরণের মত ও বোনের বিয়েতে ইজের আর টুপি পরে সং সাজতে পারবে না। সাহেবদের বেশভূষার প্রতি নিজের অতখানি অনুরাগের জন্য ওর কেমন লজ্জা হয়!

হাবিলদার চারৎ সিং-এর কোয়ার্টারের দিকে বখা পা বাড়াল। সামনেই একটা নালা। তার ওপাশে লম্বা সারি সারি ব্যারাক। লম্বা বারান্দায় কেউ নেই। মাত্র হাত বিশেক দূরে চারৎ সিং-এর ঘর। দরজাটা ভেতর থেকে ভেজানো। হাবিলদারজী হয়ত এখন বিশ্রাম করছেন। সিপাইরাও বোধ হয় ঘুমুচ্ছে। ওদের বিরক্ত করতে ওর ইচ্ছে হলো না।

বারান্দায় সেও পায়চারি করতে লাগল। তারপর এক গাছতলায় গিয়ে বসল। একটু পরেই পিতলের লোটা হাতে ক'রে চারৎ সিং ঘর থেকে বেরিয়ে

এল। বারান্দার একপাশে বসে প্রচুর জল ছিটিয়ে চোখ-মুখ ধুতে শুরু করল। নিজের প্রক্ষালন ও প্রসাধন কার্যে চারৎ সিং এত ব্যস্ত ছিল যে কিকির গাছতলায় বখাকে একবার দেখতেও পেল না। বখা উঠে এসে সেলাম ঠুকে বললে:
'সেলাম হাবিলদারজী!'

'আরে বখিয়া যে, আছিস কেমন? পল্টনের গেল হকি ম্যাচে তোকে খেলতে দেখি নি যে? ডুব মেরে ছিলি কোথায় এতদিন?'

'আমায় এখন কাজ-কম্ম করতে হয় হাবিলদারজী।'

'তোদের খালি কাজ—কাজ আর কাজ! রেখে দে অত সব কাজ। চারৎ সিং উঠে দাঁড়াল। গামছাটায় মুখখানা মুছে নিয়ে বারান্দার কোণ থেকে নিজের ছোট হুঁকোটা তুলে নিয়ে এক ছিলিম তামাক সেজে কলকেটা বখার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে:

'যা তো বেটা, রান্না ঘর থেকে একটু আগুন নিয়ে আয় তো।'

বখা থ' বনে যায়। চারৎ সিং বলছেন কি। চারৎ সিং জাত-হিন্দু হয়ে তাকে বলছেন কলকের আগুন নিয়ে আসতে রান্না ঘর থেকে?

সে যে অচ্ছুত—জাতে ধাঙড়, সে-কথা হাবিলদারজী ভুলে গেছেন নাকি? ভুলবেনই বা কি ক'রে? আজ সকালে তো তিনিই তাকে টাট্টি সাফ করতে ডেকেছিলেন। হ্যাঁ, সব জেনে-শুনেই তাকে কলকের আগুন আনতে বলছেন। হুঁকোটা কি জল-ভর্তি আছে, না খালি?

কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল ক'রে হাবিলদারজীর দিকে তাকিয়ে থাকে বখা। অপূর্ব এক পুলক সর্বাঙ্গে ওর খেলে যায়। কলকেটা চারৎ সিং-এর হাত থেকে সাদরে নিয়ে পা বাড়ায় ও রান্না ঘরের দিকে।

'ঠাকুরটাকেও একবার ডেকে দিস বখা।' চারৎ সিং-এর গলা ও শুনতে পেল পেছন থেকে। 'আমার চা-টা দিতে বলিস।'

'আচ্ছা, হাবিলদারজী।' ছুটে যেতে যেতে বখা জবাব দিল।

রান্নাঘরে কাঁচা উনুনটির সামনে বসে ঠাকুরমশাই তখন আলুর খোলা

ছাড়াচ্ছিল। উনুনটার উপর পিতলের একটা প্রকাণ্ড ডেকচি চাপানো। কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে একরাশ ধোঁয়া উঠছে সচ্‌প্যানটার মুখ থেকে।

'হাবিলদারজীর কলকের জন্যে একটু আগুন দিন তো ঠাকুরমশাই।' বখা রান্নাঘরের দোর গোড়ায় এসে আগুন চাইল ঠাকুরের কাছে।

ঠাকুর বখার দিকে কটমট ক'রে তাকাল। মনে মনে বুঝি বলল: 'তুই আবার এলি কেন?' কিন্তু বখার হাতে হাবিলদাব চারৎ সিং-এর কলকেটা দেখে ঠাকুর মুখে কিছু বলল না। এর কারণও আছে। হাবিল-দারজীর প্রতি ঠাকুর মশায়েব মনটা তুষ্ট ছিল। ওবার ছুটিতে বাড়ি যাবার আগে নতুন একটা কাচা শার্ট আর ধবধবে একটা পাগড়ী চারৎ সিং বকশিশ দিয়ে গিয়েছিল ঠাকুর মশাইকে। ঠাকুর তাই দুটো জ্বলন্ত কাঠকয়লা বখার দিকে এগিয়ে দিল। কয়লা দু'টি কলকেতে তুলতে তুলতে বখার আজ সকাল বেলাকার স্বপ্নে-দেখা সেই দৃশ্যটিব কথা মনে পড়ে যায়, কানা-গলিটার ক্রন্দনরত সেই মেয়েটার কথা—যার দিকে শ্যাকরাটি একটি জ্বলন্ত কয়লা এগিয়ে দিয়েছিল।

'বহুত মেহেরবানি,' বখা কৃতজ্ঞতায় গলে পড়ে: 'হাবিলদারজী আপনাকে তাঁর চা-টা নিয়ে যেতে বলেছেন।'

চারৎ সিং তখন আরাম কেদারায় আরাম ক'রে বসেছিল। বখা এসে কলকেটা তার হাতে তুলে দিল। কলকেটা হুঁকোর মাথায় বসিয়ে আপন মনে তামাক টানতে লাগল।

বখা এখন করে কি? বারান্দার একপাশে একখানা ইঁটের উপর গিয়ে বসল ও। হুঁকো দেখলেই মনটা ওর কেমন চুলবুল ক'রে ওঠে। ইচ্ছে হয় একটান টেনে নেয়। আচ্ছা, হকি-ষ্টিকখানার কথা কি হাবিলদারজী ভুলে গেছেন? কই, দেবার একবার নামও তো করছেন না। বখা রীতিমত অধৈর্য হয়ে ওঠে। ঠিক এমন সময় ঠাকুরমশাই একটা মগ আর এক গামলা চা নিয়ে হাজির হলো।

বারান্দার একপাশে চড়ুই পাখীদের জন্য একটা জলপাত্র পড়ে ছিল। চারৎ সিং বখাকে সেটা দেখিয়ে বলল :

'ও বেটা ওটা নিয়ে এদিকে আয় তো।'

বখা পাত্রটা নিয়ে এগিয়ে যেতেই চারৎ সিং নিজের গ্লাস থেকে খানিকটা চা বখার হাতের পাত্রটায় ঢেলে দিল।

'না না জী, একি করছেন?' বখা মৃদু প্রতিবাদ ক'রে ওঠে।

চারৎ সিং ওর পাত্রে আরও খানিকটা চা ঢেলে দিয়ে বললে :

'নে নে, খেয়ে নে বেটা—'

'বহুত মেহেরবানি হাবিলদারজী, আমার প্রতি আপনার বহুত দয়া।'

'খেয়ে নে চা-টা, সারা দিন কাজ-কর্ম করিস, চা-টা খেলে পর দেখবি বেশ ভালোই লাগবে।'

বখা সবটা ঢকঢক ক'রে গিলে নিয়ে পাত্রটা যথাস্থানে রেখে এল। চারৎ সিং এদিকে বার বার একটু একটু ক'রে চায়ে চুমুক বসাতে লাগল আর নিজের ভিজে সরু গোঁফ জোড়া ঠোঁট আর জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে বললে : 'এবার একখানা হকি ষ্টিক চাই কেমন রে?'

চারৎ সিং উঠে নিজের পাশের ঘরে গিয়ে একটু পরেই নতুন একখানা ষ্টিক হাতে ক'রে বেরিয়ে এল।

'এ যে একেবারে আনকোরা দেখছি, হাবিলদারজী।' বখা ষ্টিকখানা হাত বাড়িয়ে নিয়ে বলল।

'আনকোরা হোক আর যাই হোক তোর তাতে কি? কোটের মধ্যে ক'রে নিয়ে যা—পালা। কাউকে বলিস না যেন।'

হাবিলদারজী বুঝি চেয়ে আছেন। বখা চোখ খুলে একবারও তাকাতে পারল না। মাথাটি ওর ঝুলে পড়ে বুকের ওপর। সদাশয় মহৎ ব্যক্তিটির দিকে মুখ তুলে ও তাকায় কি ক'রে? কি দয়া! আশ্চর্য, কি অসীম দয়া মানুষটার। ও অবাক্ হয়ে যায়। অমন ভালো মানুষটার সম্পর্কে একটু আগে কি ধারণাটাই

না করেছিল ! সত্যি কি দয়া। নতুন আনকোরা একখানা ষ্টিকই কিনা দিয়ে দিল তাকে। ওভারকোটের নীচে লুকনো ষ্টিকখানা ও বার ক'রে দেখে একবার। ষ্টিকখানা কি সুন্দর চকচকে; গায়ে 'অঙ্গরেজা' লেখা। গোটা দুনিয়ায় অমন আর একটা ষ্টিক আছে কিনা সন্দেহ। 'সত্যি, ভারী সুন্দর!' বখা বিড়বিড় ক'রে বলে। বুকটা তার ঢিপঢিপ করতে থাকে। বাঁক ফিরে সে নালার দিকে পা বাড়ায়। বলে আঘাত করার ভঙ্গিতে ষ্টিকখানা এককার মাটি ছুঁইয়ে নেয়। খুবই ভালো ষ্টিকখানা, বল মারবার সময় কেমন দুমড়ে গেল! ভালো ষ্টিকের লক্ষণই তো ওই।

পরক্ষণেই সে ষ্টিকখানা মাটি থেকে তুলে নেয়। ধুলোটা মুছে নেয় পরম যত্নে। চামড়া-মোড়া হাতলটা আঁকড়ে ধরল ও দু'হাতে। কেমন যেন তার ভয় হয়। কেউ এসে যদি ষ্টিকখানা কেড়ে নেয় তার হাত থেকে! চলতে চলতে বখা চাবৎ সিং-এর কথা ভাবতে থাকে। সত্যি, মানুষটা কি দয়ালু। মাথা তার খাবাপ কিনা, তাই ও ভাবতে গিয়েছিল, হাবিলদারজী ভুলে গেছেন ওর কথা।

আচ্ছা, কি সুন্দর শরৎকালের বিকালটা। মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ। রোদে চারিদিক ঝলমল করছে। বখার বুকটা নেচে ওঠে আনন্দে। পথে কেউ নেই। একটা সিপাই পর্যন্ত গেল না পাশ দিয়ে। ছোটা কি রামচরণ কিংবা ওদের দলের আর কারো দেখা পেলে ও ষ্টিকখানা দেখাত। না না, রামচরণকে কিছুতেই দেখাবে না ও। দেখালে পরে অমন আর একখানা ষ্টিক-এর জন্য হাবিলদারজীর কাছে ধর্ণা দেবে সে। উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলবে তাঁকে। হাবিলদারজী তাহলে রাগ করবেন। কাউকে এই কথা না বলতে তিনি বার বার সাবধান ক'রে দিয়েছেন।...বাবুদের ছেলে দুটো এই সময় এলে বেশ হতো। বলটি যে আছে তাদের কাছে। আর বড় দাদাবাবু তো তাকে বিকেল থেকে অঙ্গরেজী পড়াবেন ব'লে বলেও ছিলেন।

সত্যি কেউ এলে হয় এখন। অন্যমনস্ক হয়ে বখা পায়চারি করতে থাকে।

কিছু দূরে বাবুদের ছোট ছেলেটিকে দেখা গেল ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে। হাতে তার প্রকাণ্ড একখানা ষ্টিক। বাবুদের ছোট ছেলেটির খেলার বাতিকের কথা বখা ভুলে যায় নি এর মধ্যে। ওর দিকে সে এগিয়ে গেল। বখাকে দেখে বাবুদের ছোট ছেলেটি সোৎসাহে বলে উঠল :

'সেই সকালবেলা তোকে বললাম না, চারৎ সিং আমায় একখানা নতুন ষ্টিক দিয়েছে, এই দেখ সেটা।

'ওঃ, ভারি সুন্দর তো!' বখা বলে উঠল : 'কিন্তু এই দেখুন আমারটা, আপনারটার চাইতেও সুন্দর।'

'কই দেখি?'

বখা ষ্টিকখানা বাবুদের ছোট ছেলেটির হাতে দিল।

ছেলেটি সবিস্ময়ে বলে উঠল :

'আরে, এটা যে ঠিক আমার মত!' বখার বুক আনন্দে ভরে উঠল। আর যাই হোক, ধাঙড় বলে হাবিলদারজী তার প্রতি আলাদা কোন ব্যবহার করেন নি। বাবুদের ছেলেকে যা দিয়েছেন তাকেও দিয়েছেন তাই।

'ওরে বখা, আজ তুই খেলছিস তো?' বাবুদের ছোট ছেলেটি পাকা খেলোয়াড়ের মত প্রশ্ন করে বখাকে।

'হ্যাঁ, খেলবো। বখা হেসে জবাব দেয়। প্রবল উৎসাহ আর উদ্দীপনায় ভরপুর বাবুদের এ ছেলেটাকে তার সত্যি ভালো লাগে। শুধায় : 'বড় দাদাবাবু কোথায় গেলেন?'

'ও খাচ্ছে, এক্ষুণি এসে পড়বে। দাঁড়া, বল আর ষ্টিকগুলো আমি নিয়ে আসছি। ছেলেরা সব এসে পড়বে এক্ষুণি।' লাফাতে লাফাতে সে ঢুকে পড়ল বাড়ির মধ্যে।

বখা তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। তখনো এত ছোট, বড়দের মত খেলবার কি অসীম আগ্রহ! বড় হয়ে নিশ্চয় অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কেউ একজন

হবেন। হয়ত হবেন কোন বড়বাবু কিংবা কোন সাহেব। উজ্জ্বল চোখ দু'টিও সাক্ষ্য দেবে তার!—

'ওরে বখা!'

বখা বাধা পায়, ছেদ পড়ে ওর চিন্তার সূত্রের। চমকে উঠে ও ফিরে তাকায়। ছোটা আব রামচরণের পিছু পিছু একদঙ্গল ছেলে—দর্জিদের ইব্রাহিম, ঢাল তৈরিওয়ালাদের ছেলে নাইমাৎ আর আশমাৎ, ব্যাণ্ড মাষ্টারদের ছেলে আলি, আবদুল্লা, হাসান আর হোসেন এবং তাদের পেছনে তের নম্বর পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একদল ছোকরা আসছে হৈ হল্লা ক'রে। বখা তাদের দিকে এগিয়ে গেল। ছোটা ছুটে এসে কানে কানে ফিসফিস ক'রে বললে:

'হ্যাঁরে. আমি ওদের বলে দিয়েছি. তুই সাহেবের বেয়ারা। তুই যে জাতে ধাঙড় ওরা কেউ জানে না কিন্তু।'

বখা জানে পাঞ্জাবী ছোঁড়াদের টিমে গোঁড়া এমন হয়ত কেউ কেউ আছে যারা বখাব সঙ্গে খেলতে আপত্তি করবে। ও নীরবে সায় দেয়। তারপর বন্ধুকে নতুন ষ্টিকখানা দেখিয়ে বলে:

'চারৎ সিং দিয়েছেন রে, রামচরণকে কিন্তু বলিস না যেন। দেখিস আজ কয়টা গোল করি ওখানা দিয়ে।'

'বাঃ, ভারি সুন্দর তো! চমৎকার ষ্টিকখানা রে!' ছোটা সবিস্ময়ে চিৎকার ক'রে উঠল। 'শালা, তোর বরাতটা ভালো!' ওভার-কোটটা থেকে একরাশ ধুলোর ঝড় তুলে বখার পিঠটা সে চাপড়ে দেয়। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে:

'এখন রেডি হয়ে নাও তোমরা সব।

কে কে আজ খেলবে তাই নিয়ে যখন টিম বাছাই হচ্ছিল, বাবুদের ছোট ছেলেটি তখন একগাদা ষ্টিক এনে হাজির করলে ছোটার সামনে। প্রতিদানে ছোটা কিন্তু তাকে একবার খেলতেও বলল না। সে তার দল আগেই বেছে নিয়েছে।

'ছেলেমানুষ, ওকে সুদ্ধু নে না রে!' বখা ওকালতি করলো বাবুদের ছোট ছেলেটির জন্যে।

'না। এ বড় ছেলেদের ম্যাচ। কোথাও লেগে-টেগে বসলে ওকে নিয়ে ভারী বিপদ হবে তখন।'

বখা এ নিয়ে আর বিশেষ বাড়াবাড়ি করল না।

মাঠের একপাশে ছাড়া কাপড়-চোপড়গুলো সব গাদা ক'রে রাখা হয়েছিল। বাবুদের ছোট ছেলেটা তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। খেলা শুরু হতেই বখা এক ফাঁকে ছুটে এসে নিজের ওভার-কোটটা তার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে বললে:

'ওটার ওপর চোখ রাখবেন দাদাবাবু।' এ দায়িত্ব দিয়ে যেন ছেলেটির মনের দুঃখ মোচন করতে চায় কিছুটা বখা। পরক্ষণে সে তার জায়গায় ফিরে গেল।

বাবুদের ছোট ছেলেটি সহসা দু'হাত তুলে চিৎকার ক'রে উঠল পরম উল্লাসে। চিৎকার ক'রে ওঠবারই কথা। সত্যি দেখবার মতই দৃশ্যটি! খেলায় বিশেষ কোন শৃঙ্খলা ছিল না। যে যার খুশিমত মাঠের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গাঙ্ ফড়িং-এর মত লাফালাফি ছোটাছুটি ক'রে বেড়াচ্ছিল! তবু বখা বিপক্ষ-দলের সবাইকে বেমালুম ফাঁকি দিয়ে বল নিয়ে হাজির হলো একত্রিশ নম্বর পাঞ্জাবী দলের গোলের সামনে চারিদিক থেকে সবাই এসে ওকে ঘিরে ধরল। বখা কিন্তু না ছেড়ে সবাইকে পাশ কাটিয়ে বলটাকে সে সটান চালান ক'রে দিল বিপক্ষদলের গোলের মধ্যে। চারদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। পাঞ্জাবী দলের গোলরক্ষক তখন মরিয়া হয়ে বখার পায়ে এক ঘা দিয়ে বসল। তাই দেখে ছোটা রামচরণ, আলি, আবদুল্লা ডোগরা দলের বাদবাকী সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল পাঞ্জাবী দলের গোলরক্ষকটির উপর।

দেখতে দেখতে দুই পক্ষে তুমুল মারামারি শুরু হয়ে গেল। পাঞ্জাবী টিমের ক্যাপ্টেন 'ফাউল—ফাউল' বলে চিৎকার ক'রে উঠল।

ছোটাও সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার ক'রে উঠল: 'ফাউল কোথায়! ফাউল কোথায়!'

পাঞ্জাবী দলের ক্যাপ্টেন রুখে এল। ডোগরা দলের ছেলেদের ঠেলে দিল সরিয়ে। তারপর বজ্রমুষ্টিতে ছোটার জামার কলারটা আঁকড়ে ধরল। ছোটাও ছাড়বার পাত্র নয়। সে তার প্রতিপক্ষের টুঁটিটা চেপে ধরল। তারপর দু'জনের মধ্যে ঘুষোঘুষি ধস্তাধস্তি রাম-রাবণের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বাকি সকলেও স্টিক নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু ক'রে দিল। গতিক মন্দ দেখে পাঞ্জাবী দলের ছোকরারা পিছু হঠতে লাগল।

'ইঁটা চালা—' ছোটা তার সাঙ্গপাঙ্গদের নির্দেশ দিল এক এক সময়।

আকস্মিক মারামারি আর হট্টগোলের মধ্যে সবাই বাবুদের ছোট ছেলেটির কথা ভুলেই গিয়েছিল। কাপড়-চোপড়ের পাহাড়ের সামনে সে তখনও তার নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে ঘটনাটা লক্ষ্য করছিল। ইষ্টক বর্ষণ এবার শুরু হতেই সব ধকলটা গিয়ে পড়ল তার উপর। প্রায় সব ক'টা মাথার উপর দিয়ে পার হয়ে গেলেও রামচরণের নিক্ষিপ্ত একখানা ইঁট তার মাথার পেছন দিক দিয়ে এসে লাগল সশব্দে। ছেলেটি একটা চিৎকার ক'রে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। মারামারি ফেলে সবাই ছুটে গেল তার দিকে। ছেলেটির মাথাটা ফেটে গিয়ে ফিন্‌কি দিয়ে তখন রক্তের স্রোত বইতে শুরু করেছে। বখা সহসা ছুটে গিয়ে দু'হাতে ওকে কোলে তুলে নিল। তারপর ওদের বাড়ির দিকে পা বাড়াল। পথে দেখা ছেলেটির মায়ের সঙ্গে। বখাকে দেখেই ওর মা খেঁকিয়ে উঠল:

'তবে রে নচ্ছার বেটা ধাঙড় কোথাকার, কি করেছিস রে তুই আমার বাছার?'

বখা কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ছেলেটার মাথা থেকে অবিশ্রান্ত রক্ত ঝরতে দেখে ওর মা বখাকে থামিয়ে দিল। বুক চাপড়ে চিৎকার ক'রে উঠল:

'তবে রে শতেক খেকো বেজন্মা, আমার বাছাকে খুন ক'রে এসেছে গো!'

বধার দিকে ও হাত বাড়াল। 'দে, আমার বাছাকে আমার কোলে দে! ওকে খালি খুন ক'রে আনে নি, আমার বাড়িটা সুদ্ধ ছুঁয়ে অপবিত্র ক'রে দিলে গো!'

'মা মা, ওকি কথা বলছ মা?' বাবুদের বড় ছেলেটি সহসা এগিয়ে এসে বাধা দিল। বধা তো ওকে মারে নি মা। রামচরণ—সেই ধুপীদের ছেলেই ওকে ইট মে'রছে।'

'মা-যা, দুর হয়ে যা, তুই আমার কাছ থেকে। কোথায় ছিলি তুই শুনি? ভাইকে একবার দেখতে পারলি নে?'

কোল থেকে ওকে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিয়ে বধা নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। ব্যথা ও বেদনায় মনটা তার কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠল। কি করেছে ও যার প্রতিদানে ওকে আজ এই বিরূপ ব্যবহার পেতে হলো? বাবুদের ছোট ছেলেটিকে ও কম ভালবাসে? ছোটা তখন ওকে খেলায় নেয় নি বলে সেই মনে বেশী আঘাত পেয়েছিল। তবু ওর প্রতি এই ব্যবহার কেন? কেনই বা মিছিমিছি বকলেন উনি? হ্যাঁ, ও অবশ্য ওকে ছুঁয়েছে। কিন্তু ছেলেটা যে জখম হয়ে পড়ল মাটিতে। না ছুঁয়ে ওকে মাঠ থেকে আনে কি ক'রে··· ঝগড়াটা না বাঁধলেই ভালো হতো।··· আমার গোল-করা নিয়েই না সব ঝগড়ার সূত্রপাত! নিজেকে ধিক্কার দেয় বধা। আহা, ছেলেটি জবর চোট পেয়েছে। খুব সাংঘাতিক কিছু না হয়ে থাকে!

ও এবার সজাগ হয়ে ওঠে নিজের সম্পর্কে। তার আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। ধাঙড়পল্লী। পোড়ো জমিটার উপরে একঝাঁক চড়ুই পাখী বিকেল বেলাকার পড়ন্ত রোদে কিচির-মিচির ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বধা চমকে চমকে উঠে বগলের নীচের ষ্টিকখানা আঁকড়ে ধরে। তারপর একটা গলিতে গিয়ে এক ফণীমনসার ঝোপের মধ্যে ষ্টিকখানা লুকিয়ে রাখলে। চারদিকে তাকিয়ে দেখলে, কেউ আবার না দেখে থাকে, ও চলে গেলে হয়ত তুলে নিয়ে যাবে। তক্ষুণি হয়ত বাড়ি গিয়ে টাট্টি সাফ করে নি ব'লে গাল খেতে

হবে ওকে। বখা বাড়ি এসে দেখল বুড়ো বাপ একখানা চেয়ারের উপর বসে গুড়গুড় ক'রে হুঁকো টানছে। ছেলেকে দেখেই লখা তেড়ে মারতে গেল। হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার ক'রে বলে উঠল :

'কুত্তিকা বাচ্চা, শূয়োর কোথাকার! এতক্ষণে ফেরা হলো বুঝি? সারা বিকেলভর ছিলি কোথা শুনি? একেবারে নবাব বনে গেছিস, না? বলি, বেজন্মা, এখানকার কাজ-কর্ম সব করে কে? সেপাই লোক সব ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে গেল!'

বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমন ধরনের বিরূপ অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল না বখা। তবু ও চুপ ক'রে রইল। মাথা পেতে নিল সব ভর্ৎসনা আর তিরস্কার। লখা তখনও সমানে বকে চলেছে :

'বেজন্মা, শূয়োরকা বাচ্ছা, সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছিস আর এখন ভরসন্ধ্যায় ফেরা হলো? এদিকে বুড়ো বাপবেটা বাঁচল কি মরল, তার খেয়াল পর্যন্ত নেই? বলি ধাঙড়বেটাব আবার সাহেব হবার অত সখ কেন? টাট্টিগুলো ওখানকার সাফ করে কে, শূয়োর কোথাকার।'

বখা টাট্টি-সাফার ঝাড়ুখানা নিয়ে এগিয়ে গেল। দেখল, রখা কখন এসে ঝাড়ুখানা হাতে তুলে নিয়েছে। দাদার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে টিপ্পনী না কেটে সে ছাড়ল না :

'তা, ফেরা হলো কখন সাহেবের?

'সারাদিন খালি খেলা-খেলা—খেলা! বেজন্মা শূয়োরের বাচ্চাটার একটু কি লজ্জা আছে?' লখা তখনও সমানে বকে চলেছে।

বখা আর সহ্য করতে না পেরে বাইরের দিকে পা বাড়াল। পেছন থেকে শুনতে পেল তার বাপ তখনও চিৎকার করছে :

'দূর হ—দূর হ আমার সামনে থেকে, বেজন্মা কোথাকার। ও ঝাড়ু আর কোনদিন ধরবি তো তোকে আমি খুন ক'র ফেলব। বেরিয়ে যা তুই আমার বাড়ি থেকে। এ-মুখো আর আসবি তো মুশকিল হবে।'

সবই নিয়তির বিধান বলে ইতিপূর্বে ও এর চাইতেও অনেক বেশী গালমন্দ তিরস্কার এমন কি মার পর্যন্ত সয়ে গেছে। হাসিমুখে সব নীরবে গড়িয়ে দিয়েছে গায়ের উপর দিয়ে। টুঁ শব্দটি করে নি। হাত তুলে একবার আত্মরক্ষা পর্যন্ত করে নি। কিন্তু সেই সকাল থেকে একটাব পর একটা এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল তাতে ওর মনটা কানায় কানায় বিষিয়ে উঠেছে। সহ্যের মাত্রাটা ছাড়িয়ে গেছে। অন্তরাত্মাটি তার দপ্‌দপ ক'রে জ্বলে উঠেছে।

সামনেই মাঠ। মাঠেব বুক চিরে হনহন ক'রে ও এগিয়ে চলছে। ডান হাতে পড়ে রইল ওদেব অচ্ছুত পল্লীর সেই মজা নদীটি। ওব মনের মত অশান্ত দমকা বাতাস ছোট ছোট ঢেউ তুলেছে নদীটার বুকে। অস্তগামী সূর্যের নিস্তেজ আলোয় চিকচিক করছে ঢেউগুলি। চলতে চলতে বখা মাঠেব মাঝ-খানে থমকে দাঁড়ায়। মনে পড়ে, সকালবেলা ওই মাঠের মাঝখানেই ছুটে এসে ও প্রভাত-রবির উষা-কিরণে স্নাত হয়ে নতুন উদ্দীপনায় দিনের কাজ শুরু করেছিল।

জন-বিরল মাঠ। উত্তরে একরাশ জঞ্জাল,—অসংখ্য ভাঙাচোরা শিশিবোতল, পুরনো দোমড়ানো টিন, কুকুব-বিড়ালের বিকৃত শবের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তাদের অচ্ছুত পল্লীর মাটির ঘরগুলো দেখা যায়। দু'একজন লোক দেখা যায় আনাগোনা করছে আশেপাশে। না, আজকে কার মুখ দেখে উঠেছিল ও কে জানে, গোটা দিনটাই ওর আজ মন্দে কাটল। এক পিপুল গাছের তলায় এসে পশ্চিমদিকে মুখ ক'রে বখা বসে পড়ল।

'টুম উডাস্ আসে!' বখার কাঁধে একখানা হাত রেখে ভাঙ্গা হিন্দুস্থানীতে কে যেন বলে উঠল। বখা চমকে উঠে ফিরে তাকায়। দেখল কর্নেল হাচ্চিন্‌সন্ সাহেব কখন এসে দাঁড়িয়েছেন ওর পেছনে। কর্নেল হাচ্চিন্‌সন্ স্থানীয় 'স্যালভেশন আর্মীর' বড় পাদ্রী ওর কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। অনুন্নত অচ্ছুত পল্লীর আশেপাশে তিনি হামেশা ঘোরাফেরা করেন। এক মাইল দূর

থেকে দেখলেও তাঁকে ঠিক চেনা যায়। ভারতবর্ষে খৃষ্টান মিশনারীদের মধ্যে যারা মনে করতেন স্থানীয় লোকদের উদ্ধার ক'রে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে হলে পাদ্রীদের দেশী বেশ-ভূষা পরিধান একান্ত উচিত, তিনি হলেন সেই দলের। তিনি তাই সব সময় পরতেন শাদা একজোড়া পাতলুন, গাঢ় নীল রঙের একটা জামা আর লাল ফিতে-বাঁধা শাদা টুপি। ইউজিন স্যানণ্ডোর কাছাকাছি না হলেও এককালে তাঁর গায়ে প্রচণ্ড শক্তি ছিল। মাথায় ছিল একরাশ ঘন চুল। এখন অবশ্য সে-জায়গায় প্রকাণ্ড টাক পড়েছে। তাঁর স্ত্রীর ধারণা কিন্তু কর্নেল সাহেবের মাথায় টাক পড়েছে এদেশী লোকদের মত ঐ বিজাতীয় টুপি পরার জন্য, এবং সব সময় তিনি পড়াশুনা নিয়ে অমন ব্যস্ত থাকেন ব'লে। শুধু চুল নয়, খোদ কর্নেলদের মত এককালে তাঁর প্রকাণ্ড একজোড়া কালো পোষাকও ছিল। গোঁফের ঐ বাহার দেখেই যৌবনে মিসেস হাচ্চিন্‌সনের মন ভিজে গিয়েছিল তাঁর প্রতি। কেমব্রিজের এক মদের দোকানে তিনি আগে পরিচারিকার কাজ করতেন। মদ খেতে বসে কর্নেল হাচ্চিন্‌সনের গোঁফ জোড়াটির ডগা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা মদ চুইয়ে পড়তে দেখেই তিনি তাঁর প্রেমে ভিড়ে পড়েন। বিয়ে করেন ওঁকে। কিন্তু ঘর ছেড়ে বিদেশ-বিভূঁই ভারতবর্ষে আসাটা তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি। বাড়ীর দেশী চাকর-বাকরগুলি দেখলে তাঁর চোখ টাটিয়ে উঠত। তাছাড়া তাসখেলা, একটুখানি খানাপিনা করা কিংবা মহিলার একটু ফুর্তি করার রুচিটা কর্নেল সাহেব বুঝি বরদাস্ত করতেন না। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের মধ্যে এ নিয়ে একটু মনমালিন্যের রেশ বজায় থাকলেও কর্নেল সাহেবের প্রতি মিসেস হাচ্চিন্‌সনের প্রেমের একচুলও ফাটল ধরে নি। এখন অবশ্য কর্নেল সাহেবের গোঁফের সেই বাহার আর নেই। বয়সও তো হলো পঁয়ষট্টি বছরের মত।

পুরো বিশ বছরে মাত্র পাঁচজন স্থানীয় লোকের 'আত্মউদ্ধার' কার্য সম্পন্ন করা ভিন্ন—তাও আবার অনুন্নত অচ্ছুত পল্লীর নোংরা বাসিন্দা—খৃষ্টান পাদ্রীদের কাজ বিশেষ এগোয় নি। তবুও পাদ্রী সাহেবের মহান আদর্শ-

নিষ্ঠা আর উৎসাহের কোথাও অভাব নেই। সব সময় তিনি একগাদা হিন্দুস্থানী বাইবেলের তর্জমা কপি বগলদাবা ক'রে আর জামা ও ওভারকোটের পকেট ত্ু'টোয় লুক লিখিত সুসমাচারে ভর্তি ক'রে বেরুতেন। পথে যাকে পেতেন তাকেই একরকম জোর ক'রে একখানা কেতাব গছিয়ে তবে ছাড়তেন।

'টুম উডাস্ আসে।' পাদ্রী সাহেব এগিয়ে এসে পিঠে হাত রাখলেন। বখা চমকে উঠে ভাবল ছোটা কিংবা রামচরণ এসেছে বুঝি সান্ত্বনা দিতে; অচ্ছুত পল্লীব অন্য কেউও হতে পারে। খাস সাহেবের মুখে হিন্দুস্থানী বাত ইতিপূর্বে ও শোনে নি কখনো। পাদ্রী সাহেবকে দেখেই ও চিনে ফেলল। ও যখন ছোট ছিল, উনি প্রায়ই আসতেন তাদের বাড়িতে। পরম পিতা যীশুখ্রীষ্টের ধর্মে দীক্ষা নিতে বারবাব পেড়াপীড়ি করতেন ওর বাপকে। কিন্তু বড়ো পাদ্রী সাহেবের কথায় ওর বাপ রাজী হয় নি। বাপ-ঠাকুর্দার ধর্মই তার পক্ষে ভালো বলে বিদায় ক'রে দিয়েছে সাহেবকে।

তাদের সঙ্গে তেমন ক'রে মাথামাথি করলে কি হবে, সাহেব সাহেবই। এখনও ট্রাউজার পরে, কমোডে পায়খানা করে।...

বখা দাঁড়িয়ে কপালে সেলাম ঠুকে বলে উঠল:

'সালাম সাহেব!'

'সালাম সালাম, ঠিক হায়, ঠিক হায়,—টুম বৈঠ।' কর্নেল সাহেব ফিরিঙ্গী গলায় ভাঙা হিন্দুস্থানীতে বলে উঠলেন। ঝুঁকে পড়ে সস্নেহে শুধালেন: 'টুমার কি হয়েসে? অসুখ করেসে?'

সস্নেহ অমন কণ্ঠ - অযাচিত করুণা—বখা কেমন অভিভূত হয়ে যায়। মনে হয় ও যেন স্বপ্ন দেখছে। বিলাতী সাহেবদের মুখে ও অবশ্য 'আচ্ছা' 'যাও' 'জলদি করও,' 'শুয়োরকা বাচ্ছা' কিংবা 'কুত্তিকা বাচ্ছা' প্রভৃতি নানান হিন্দী বাত শোনে নি এমন নয়, কিন্তু অমন বিশুদ্ধ দেশী ভাষা—অমন দরদী কথা ...। অভিভূত মাথাটা ওর লজ্জায় নুয়ে পড়ল। বলল:

'কিছু না সাহেব—কিছু হয় নি। একটু হাঁপিয়ে পড়েছিলাম কিনা, তাই। আমি, সাহেব, এখানকার এক ঝাড়ুদার, লখা জমাদারের বেটা।'

'হামি টা জানে। টোমার বাবা কেমন আসে?'

'ভালো হুজুর।'

'আচ্ছা, টোমার বাবা টোমাকে কি বলেসে হামি কে আসি?' ইংরেজের সহজাত বাস্তব বুদ্ধি এবার মাথা উঁচিয়ে উঠল। শুরু হলো সোজাসুজি কাজের কথা।

'হ্যাঁ হুজুর, আপনি তো সাহেব।'

'না না, হামি সাহেব নেহি হ্যায়—সাহেব নেহি হ্যায়। টোমাদের মটো একজন আডমী আসে।' সাহেব কিছু জানে না এমন ভান ক'রে বললে: 'হামি স্যালভেশন আর্মীর পাদ্রী আসে।'

কর্নেল সাহেবদের মত পাদ্রী সাহেবদের আর সাধারণ সাহেবদের মধ্যে যে বড় রকমের তফাত আছে বখা তা জানত না। তার কাছে সবাই সাহেব। সবাই ট্রাউজার পরে, মাথায় টুপি দেয়, টুটা-ফুটা পোষাক-পরিচ্ছদগুলি তাদের মত চাকর-বাকরদের এন্তার বিলিয়ে দেয়। কর্নেল সাহেব গির্জা ঘরের আশে-পাশে কোথায় থাকেন, ও জানত। এও জানত তার সঙ্গে বৃটিশ পল্টনের ব্যারাকের পাদ্রীর খানিকটা তফাতও আছে। তবু ও মাথা নেড়ে সায় দিল:

'হ্যাঁ, সাহেব জানি বই কি।'

'হ্যাঁ, হামি পাদ্রী আসে। জগতের একমাত্র ট্রাণকর্টা যীশুখ্রীষ্টই হামার ঈশ্বর আসেন।' কর্নেল সাহেব সগর্বে বলে চললেন: 'আমাডের গির্জা ঘরে প্রভু যীশুর কাসে এলে টুমি টোমার সকল বিপডের হাট ঠেকে ট্রাণ পাবে।'

বখা রীতিমত ঘাবড়ে যায়। তার বিপদের কথা পাদ্রী সাহেব জানলেন কি ক'রে? ত্রাণকর্তা যীশু প্রভুটিই বা কে। উনি আবার গির্জা ঘরে থাকেন নাকি? পাদ্রী সাহেবটি কি ওঁর ধর্মে বাবাকে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন? ভাবতে তার কেমন যেন অবাক লাগে। জিজ্ঞেস করে:

'জগতের ত্রাণকর্তা যীশু প্রভু কে সাহেব ?'

'এসো, হামার সঙ্গে এসো, বলসি।' কর্নেল হাচ্চিন্‌সন্‌ বখার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন একরকম হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে। উৎসাহে ফেটে পড়ে বিড়-বিড় ক'রে আপন মনে গান গেয়ে উঠল :

'টোমার মাঝে হামার প্রকাশ যীশু,
জীবনখানা সঁপে ডিলুম টোমার করে—
ওগো বিনিময়ে টার চাইনি কিছু।'

বখা রীতিমত অবাক হয়ে যায়। উৎকট এক আত্মপ্রসাদ অনুভব করে সে সাহেবদের সাদর আহ্বানে। গানটার এককলি মাথা-মুণ্ডও বুঝতে না পারলেও সে ওঁর পিছু পিছু হেঁটে চলল নীরবে। পাদ্রী সাহেব তখনও আপন মনে গেয়ে চলেছেন :

'যীশু, টোমার মাঝে হামার প্রকাশ—'

যীশু! যীশু আবার কে!

জগতের ত্রাণকর্তা সেই যীশু মেশায় না কি? কে তিনি? পাদ্রী সাহেব তো বলেছেন, তিনি হলেন ঈশ্বর। হিন্দুদের দেবতা—তাঁর বাপ-ঠাকুরদা যাঁকে পূজো করে, উঠতে বসতে তাঁর মা যাঁর নাম মুখে আনত হামেশা—সেই রামচন্দ্রের মত যীশুও একজন দেবতা বুঝি? বখার মনের আনাচে-কানাচে একগাদা প্রশ্ন জমে ওঠে। এক্ষুণি বুঝি সে ফেটে পড়বে বেলুনের মত। পাদ্রী সাহেব কিন্তু তখনও আপন মনে গেয়ে চলেছেন :

'শুধু টোমার মাঝে হামার প্রকাশ যীশু,
জীবনখানা সঁপে ডিলুম টোমার করে—
ওগো বিনিময়ে যে চাইনি কিছু।'

'আচ্ছা হুজুর', গানের মাঝখানে বখা সহসা প্রশ্ন করে বসল : 'আচ্ছা হুজুর উনি কে? যীশু মশায়?'

উত্তরে কিন্তু পাদ্রী সাহেব তখনও আপন মনে গেয়ে চলেছেন : 'টোমার মাঝে—'

বথার কেমন ধাঁধা লাগে। হেঁয়ালীর মত মনে হয়, পাদ্রী সাহেবের চাপা, অস্পষ্ট, ছন্দবদ্ধ গানের কলিগুলি। কিছুই ও বুঝতে পারে না। আবার প্রশ্ন করে : 'উনি কে সাহেব ? যীশু মশায়।'

কর্নেল সাহেব সহসা যেন বাধা পান। ফিরে আসেন ধূলির ধরণীতে। জবাব দেন :

'যীশু হলেন পরম পিটা ভগবানের পুট্র। আমাডের সকলের ক্ষমার জন্য, উদ্ধারের জন্য টিলে টিলে নিজের প্রাণ বিসর্জন ডিয়েছেন।'

বথার কেমন যেন খটকা লাগে। 'আমাদের ক্ষমার জন্য তিলে তিলে তিনি প্রাণ দিলেন বিসর্জন—ভগবানের পুত্র—তার মানে কি? মার কাছে তো শুনেছি, ভগবানেরা সব থাকেন স্বর্গে, আসমানে, কেউ তাহলে ভগবানের পুত্র হয় কি ক'রে? আমাদের ক্ষমার জন্যই বা তিলে তিলে তিনি প্রাণ বিসর্জন দিলেন কি ক'রে? ক্ষমাই বা কিসের? দোষ করল কে? কে ঈশ্বরের ঐ পুত্রটি? পাদ্রী সাহেবকে সে শুধায় :

'হ্যাঁ সাহেব, যীশু মশায়টি কে? তিনি কি সাহেবদের দেবতা?'

প্রশ্নটা ক'রেই বথার কেমন যেন ভয় ভয় করতে থাকে। ও জানে ইংরেজরা চাপা লোক! কথাবার্তা বড় বিশেষ একটা বলে-টলে না। ওর প্রশ্ন শুনে, কে জানে, পাদ্রী সাহেব হয়ত কিছু মনে করছেন।

পাদ্রী সাহেব ঘাড় ফিরিয়ে জবাব দিলেন :

'হ্যাঁ বাছা, টিনি হলেন ঈশ্বরের পুট্র। আমাডের মটো পাপী-টাপীডের উটটারের জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন ডিয়েছেন।'

পাদ্রী সাহেব তারপর আপন মনে আর-একটা গান গেয়ে চললেন। গানটা একঘেয়ে বিশ্রী লাগলেও বথা মুখে কিছু বলল না। খাস সাহেবের সংস্পর্শে এসে তার বুকটা গর্বে ফুলে উঠেছে। কৌতূহলী হয়ে একসময় সে প্রশ্ন করল :

'সাহেব, আপনাদের গির্জাঘরে কি যীশু বাবারই ভজনা করা হয়?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওঁরই ভজনা করা হয়।'

পাদ্রী সাহেব নতুন ক'রে আবার গান ধরলেন। বখার সত্যিই এবার বিশ্রী লাগল। মাথা-মুণ্ড একটা কলিও যদি ও বুঝতে পারত। সাহেবের পরনে পাতলুন দেখে ও তাঁর সঙ্গ নিয়েছিল। সাহেবী বেশভূষা—পাতলুন পরাটা ওর জীবনের একমাত্র কাম্য—একমাত্র স্বপ্ন। সাহেবের মত কোট পাতলুন পরে, আর তাদের মত টিস্‌মিশ ক'রে কথা বলে ও যদি ওদের গাঁয়ের রেল-ইষ্টিশানের সেই গার্ডটির মত হতে পারত, জীবনটা বুঝি ওর ধন্য হয়ে যেত। যীশু বাবা কে—এ নিয়ে ওর এত মাথা ব্যথাই বা কেন? পাদ্রী সাহেবটি ওকে বোধ হয় ওদের নিজ ধর্মে দীক্ষা দিতে চান। অপর কোন ধর্মে দীক্ষিত হতে ও চায় না। কিন্তু যীশু বাবাটিকে জানতে আর ওর আপত্তি হবে কেন? পাদ্রী সাহেব তখনও আপন মনে গান গেয়ে চলেছেন। বার বার বলছেন যীশু বাবা হলেন ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু ঈশ্বরের আবার ছেলে হয় কি ক'রে? ঈশ্বরই বা কে? আর রামচন্দ্রের মত উনি যদি কোন দেবতা হন, তাঁর তবে আবার ছেলে হলো কবে? রামচন্দ্রের কোন ছেলে-পিলের কথা তো শোনে নি বখা জীবনে। সত্যি তার কেমন যেন ধাঁধা লাগে। সাহেবের হাত থেকে কোনরকমে পার পেতে পারলে সে যেন স্বস্তির হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

বখা অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছিল। কর্নেল সাহেব তা লক্ষ্য ক'রে মনে মনে ভাবল, হাতের শিকারটা বুঝি ফসকে গেল এবার। পরম উৎসাহে তাই তিনি জাত-পাদ্রীদের মত বখার কাছে এগিয়ে এসে ওর একখানা হাত ধরে বললেন:

'যীশু ঈশ্বরের পুত্র, বাছা। আমাদের জন্যই টিনি ক্রস কাষ্ঠে নিজের প্রাণ বিসর্জন ডিলেন। আমরা কিন্তু এখনও সেই টিমিরের মধ্যে—সেই পাপীই রয়ে গেলাম!'

ক্রস কাষ্ঠে আবার আত্মবিসর্জন কেন? বখা শুধায় নিজেকে। বাড়ির কথা তার মনে পড়ে যায়। জর জারী মহামারী কিংবা অমন কিছু একটা

তাদের বস্তিতে শুরু হলেই মা তার কালী মন্দিরে গিয়ে পাঁঠা কিংবা কিছু একটা মানত ক'রে আসত। বলি খেয়ে মা কালীর ক্রোধ তবে শান্ত হতো। বিপদের হাত থেকে তারা রক্ষা পেত। কিন্তু যীশু বাবার এই আত্মবলিদানের মানে কি? ফ্যালফ্যাল ক'রে ও পাদ্রী সাহেবের দিকে তাকিয়ে থাকে। পাদ্রী সাহেবের একসময় খেয়াল হয় ধাঙড়দের ছেলেটা তাঁর ইংরেজী ভজনের এক বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারে নি। তাই বিশদভাবে তিনি বুঝিয়ে বললেন:

'যীশু হামাডের সকলকে সমান ভালবাসেন। টাঁর কাসে ধনী আর ডরিড্র, ব্রাহ্মণ আর ভাঙ্গির কোন টফাট নেই। হামাডের সকলকে প্রেম করেন বলেই টিনি হামাডের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন ডিলেন।'

ধনী আর দরিদ্র, ব্রাহ্মণ আর ভাঙ্গির কোন তফাত নেই,—পাদ্রী সাহেবের মুখের শেষ কথাটা মনে ওর ধাক্কা দেয়। যীশু বাবার কাছে ধনী আর দরিদ্র, ব্রাহ্মণ আর ভাঙ্গির, নাট-মন্দিরের সেই বামুন পণ্ডিতটার আর তার মধ্যে কি তাহলে সত্যি কোন তফাত নেই! আগ্রহে ফেটে প'ড়ে ও প্রশ্ন করলে:

'আচ্ছা সাহেব, যীশু বাবার কাছে বামুন আর আমার মধ্যে কি কোন তফাত নেই?'

'না বাছা, যীশুর চোখে আমরা সবাই সমান।' পাদ্রী সাহেব বকবক ক'রে আউড়ে চললেন: 'টিনি হলেন ঈশ্বরের পুট্র। আর হামরা সবাই হলাম পাপী-টাপী। পরম পিটার ডরবারে টিনি হামাডেরই মধ্যস্থ হয়ে ডাঁড়ান। যীশু হামাডের সকলের উপরে।'

'সকলের উপরে', 'আমরা সবাই পাপী' কেন—কেন? কেন একজন আর একজনের উপরে থাকে—কেন এই বৈষম্য? বখার মনে সংশয় দানা বাঁধতে থাকে। দম-দেওয়া কলের গানের মত পাদ্রী সাহেব তখনও সমানে বকে চলেছেন:

'হামরা যদি আমাডের নিজ অপরাধ স্বীকার না করি, টিনি হামাডের কখনও ক্ষমা করবেন না। আর টিনি ক্ষমা না করলে অনন্ত নরক ভোগ

করটে হবে হামাডের। বাছা, হামার কাছে টুমি টোমার সব ডোষ স্বীকার ক'রে ফেল। আমি টখন টোমায় হামাডের খ্রীষ্টান ধর্মে ডীক্ষা ডেব।'

'কিন্তু হুজুর, যীশু বাবাকে আমার তো এখনও জানা হলো না। ঠাকুর রামচন্দ্রের কথা শুনেছি। কিন্তু যীশু বাবার কথা তো কিছুই জানি না।'

'টোমাডের রামচন্দ্র হলো পৌত্তলিকদের ডেবটা।' পাদ্রী সাহেব একটু থেমে জবাব দিলেন: 'এসো বাছা, হামার সঙ্গে এসে ডোষ সব স্বীকার ক'রে ফেল। তাহলে টোমার মৃট্যুর পর যীশু টোমায় উদ্ধার করবেন।'

সাহেব হোক আর যেই হোক, বখার মোটেই ভালো লাগছিল না এসব প্রসঙ্গ। দীক্ষার নাম শুনে ও রীতিমত আঁতকে উঠল। পাদ্রী সাহেবের মতলবখানা কি? তাকে কেউ পাপী বলুক, ও তা বরদাস্ত করতে পারে না। এমন কি পাপই বা করেছে ও! ঘটা ক'রে তা আবার স্বীকার করবার কি আছে? যত সব বাজে বুজরুকি! পাপ স্বীকার ক'রে এমন কি ফায়দা হবে? সাহেবটা ওর কাছ থেকে গোপন কিছু একটা জেনে নিতে চাইছে নাকি? স্বর্গে গিয়ে কাজ নেই বাপু। আর হিন্দুরা সে-সব বিশ্বাসও করে না। ওতো শুনেছে মানুষ মরে কিছু না কিছু একটা হয়ে আবার পরজন্ম গ্রহণ করে। পরজন্মে কুকুর কিংবা গাধা না হলেই হলো।…

যীশু বাবাটি কিন্তু খুবই ভালো লোক। বখা আবার ভাবে: 'তাঁর কাছে বামুন আর ভাঙ্গির কোন তফাত নেই। কিন্তু যীশু বাবাটিই বা কে? এলেনই বা কোথা থেকে? কই, পাদ্রী সাহেব তো কিছু বলল না সে-সব? টুটা-ফুটা একজোড়া পাতলুন হয়ত এবার দিয়ে দেবেন বখাকে।' নেহাত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বখা চলল পাদ্রী সাহেবের পিছু পিছু হেঁটে।

এক সার নিম গাছের মাঝখানে বাংলো ধরনের একখানা কোঠাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কর্নেল সাহেব সহসা বলে উঠলেন:

'এই যে হামার বাড়ি!'

এ বাড়ির সামনে দিয়ে বখা বহুবার যাতায়াত করেছে।

'হ্যাঁ সাহেব, আমি জানি।

বছর পাঁচেক আগে ওটা ছিল একটা হিন্দুর আবকারির ডিপো। আফিং তৈরি হতো ওখানটায়। জায়গাটা দখল করতে গিয়ে তাঁকে কম বেগ পেতে হয় নি। পাদ্রী সাহেব সগর্বে বাড়িখানা দখল করার ইতিহাস বললেন। যীশুখ্রীষ্টের অপার করুণায় মুখর হয়ে তিনি গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলে উঠলেন: 'হে প্রভু, টুমি কি মহান্, কি বিচিট্র টোমার লীলা। প্রভু, টুমি সত্যি জগটে আলোর বন্যা বহন ক'রে এনেস।'

তিনি তারপর বখার দিকে তাকালেন। বললেন: 'তাঁরই অপার করুণায় হামি পৌটলিক বিধর্মীডের উৎখাত করতে সক্ষম হয়েসি।'

উঠোনের মাঝখানে লম্বা ঘাড়-উঁচু গির্জা ঘরটা থেকে চাপা অস্পষ্ট একটা ভজনের সুর ভেসে আসছিল। কর্নেল সাহেব তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আবৃত্তি ক'রে উঠলেন।

'জর্জ—জর্জ', চা হয়ে গেছে।' কর্নেল সাহেবের ক্ষীণ কণ্ঠ ছাপিয়ে ভিতর-বাড়ি থেকে হঠাৎ ভেসে এল মোটা বাজখাঁই গলা।

'আসছি গো, আসছি!' কর্নেল সাহেব জবাব দিলেন। স্ত্রীকে তিনি রীতিমত ভয় করেন। বিপদে পড়লেন বখাকে নিয়ে। ভেবে উঠতে পারলেন না বখাকে নিয়ে এখন কি করবেন। ওকে সঙ্গে ক'রে বাংলোয় ঢুকবেন, না গির্জা ঘরে যাবেন? সত্যি, তিনি উভয়-সংকটেই পড়লেন।

'করছো কি শুনি? সারা বিকেল ছিলে কোথায়?' ভিতর বাড়ি থেকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর আবার ভেসে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় এসে হাজির হলেন বিপুল ভুঁড়িওয়ালা বেঁটেখাটো আধবয়সী এক মেমসাহেব। একরাশ পাউডার ঘষা মুখখানা তার গোল; রুজ-মাখা ঠোঁটে লম্বা হোলডার সমেত এক জলন্ত সিগারেট; খুদে খুদে দু'টি চোখে একজোড়া পাঁসনে চশমা, মাথার কালো চুলগুলি 'ইটন্-ছাঁটা,' আর বিচিত্র রঙচঙে একটা সুতির ছাপা ফ্রক বক্ষদেশ থেকে শুরু ক'রে হাঁটু পর্যন্ত এসে হঠাৎ বেহায়াভাবে ফুরিয়ে গেছে।

'নোংরা কালা আদমীদের সঙ্গে আবার মাখামাখি ঢলাঢলি শুরু করেছ বুঝি? নাঃ, তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না!' মেমসাহেব সহসা ঝংকার দিয়ে উঠল ওদের দু'জনকে দেখে।— 'নাঃ তোমাকে নিয়ে আর সত্যি পারা গেল না। গত হপ্তায় না তুমি কংগ্রেসওয়ালাদের হাতে অমন মারটা খেলে? তবুও বুঝি তোমার শিক্ষা হলো না।'

'কি হলো? আসছি গো, আসছি।' বিপন্ন কর্নেল সাহেব জবাব দিলেন।

ব্যাপারটা খুব সুবিধার নয় দেখে বথা নিঃশব্দে কেটে পড়ছিল। কর্নেল সাহেব তা দেখতে পেয়ে ওর একখানা হাত ধরে বলে উঠলেন:

'আরে ডাঁড়াও ডাঁড়াও—টোমাকে আমি গির্জা-ঘরে নিয়ে যাচ্ছি।

'হ্যাঁ, এখন তুমি ওকে গির্জায় নিয়ে যাও, আর এদিকে চা-টা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাক!' মেরী হাচ্চিন্‌সন্ আবার ঝংকার দিয়ে উঠলেন: 'রাজ্যের যত সব নোংরা ছোটলোক ভাঙ্গি আর চামার নিয়ে তুমি ঢলাঢলি করতে থাক আব আমি তোমার চা নিয়ে বসে থাকি! আমারটা আমি খেয়ে নিচ্ছি গে?' রাগে গজগজ করতে করতে মেমসাহেব ভিতর বাড়িতে ঢুকে পড়লেন।

'সালাম সাহেব, সালাম!'

বথা মেমসাহেবের তর্জন-গর্জনের মূল কারণটা কিছুই বুঝতে পারে নি। তবু তার মুখে ভাঙ্গি আর চামার কথা দু'বার উচ্চারিত হতে দেখে ব্যাপারটা ও কিছুটা যেন আন্দাজ ক'রে নিলে। পাদ্রীর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে সটান ও দৌড় দিল।

'আরে ডাঁড়াও বাছা, ডাঁড়াও।' পাদ্রী সাহেব পেছন থেকে চিৎকার ক'রে উঠলেন।

ছাড়া পেয়ে বথা প্রাণপণে দৌড়োতে লাগল। ভয় হলো, কি জানি মেম-সাহেব যদি তেড়ে এসে ডাইনীর মত সত্যি সত্যি ওর ঘাড়টা মটকে দেন!

দ্রুত অপসৃয়মান বথার দিকে তাকিয়ে পাদ্রী সাহেব তখন আপন মনে গেয়ে উঠলেন:

"ধন্য তোমার প্রেম প্রভু,
ধন্য তোমার নাম।"

সবাই যেন ওর পেছনে লেগেছে। খুঁটেখুঁটে কিছু একটা বার করা চাই! একসময় মন্থর হয়ে আসে বখার চলার গতি; আপন মনে ও ভাবতে থাকে। পাদ্রী সাহেবই তো ওকে ডেকে এনেছিল নিজে। বলেছিল সব দোষ স্বীকার ক'রে ফেলতে। বাপস্, মেমসাহেব তো না, যেন কেউটে সাপ! ভাঙ্গি আর চামারদের উল্লেখ ক'রে কি যে সব বলছিল কে জানে? বাপস্, সাহেবের উপর কী রাগ? ওকে দেখেই তো মেমসাহেবের মেজাজ বিগড়ে গেল। পাদ্রী সাহেবকে কি ও সাধাসাধি করেছিল এখানে ওকে নিয়ে আসতে? উনি নিজে এসেই তো ওর সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা কইলেন। আহা, পাতলুন জোড়াটি আর চেয়ে নেওয়া হলো না! মেমসাহেবটি অমন রাগ না করলে ও ঠিক চেয়ে বসত।...

বখা ভাবতে থাকে যেতে যেতে। মনটা ওর টনটন ক'রে ওঠে। সকালবেলাকার তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলি আবার হানা দেয় ওর মনের আনাচে-কানাচে। নিজেকে ওর বড় ক্লান্ত অসহায় মনে হয়।...আশেপাশের ভিজে মাঠ থেকে একটা সোঁদা গন্ধ উঠতে থাকে—নাকে এসে লাগে ওর। দূর দিগন্তের কোণ ঘেঁষে ঢলে পড়েছে অস্তগামী সূর্য। দেখে মনে হয় যেন স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে পটে আঁকা ছবির মত। মাঠ-ঘাট, বন-বনান্তের সর্বত্র বিরাট সাড়া পড়ে গেছে পাট গুছিয়ে নেবার। দীর্ঘ সারির পর সারি বেঁধে পাখীরা সব নিজ নিজ কুলায় ফিরে চলেছে বুলাশা শহরের সন্ধ্যার হিমেল আকাশকে কলকাকলিতে মুখরিত ক'রে। ঝিঁঝি পোকারা খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে ঐকতান জুড়েছে সকলে মিলে। দূরে কোথাও বুঝি শাঁক বেজে উঠল। পথের দু'পাশের ঘাসের নরম ডগাগুলির উপর সূর্যের সোনালী আলো পড়ে ঝলমল
।

চলতে চলতে বখার চোখ গিয়ে পড়ে একসময় এক কুষ্ঠ রোগীর উপর।

পরনে একগাদা ছেঁড়া ন্যাকড়া; সর্বাঙ্গে গলিত ঘা দগদগ করছে। রাস্তার একপাশে বসে হাত তুলে সে ভিক্ষে চাইছে আর করুণস্বরে অনুনয় করছে: 'বাবা একটো পেসা দে।'

বখা আঁতকে ওঠে। দু'পা হটে এসে পাশ কাটিয়ে ও এগিয়ে গিয়ে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে হাঁটতে থাকে। নিকটেই বুলাশা রেল ইষ্টশান। আশে-পাশে বিস্তর পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে যাত্রীদের ভীড়। রাস্তার একপাশে গোটা-কয়েক খাবারের দোকান। এক ভিখারী মেয়ে একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবার চাইছে। কোলে তার একটি ছেলে, পিঠের ঝোলায় আর-একটি বাঁধা। আর-একটি পরনের নোংরা কাপড় আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট কয়েকটা ছেলে ট্রেনের আশেপাশে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে। পয়সা চাইছে গাড়ির যাত্রীদের কাছে। কিন্তু কেউ একটা পয়সাও দিচ্ছে না। ভিখারীদেব কাতর কাকুতি-মিনতিতে বখা মনে মনে একটা উৎকট আনন্দ লাভ করে; আবার বিশ্রী বিরক্তও লাগে একটা পয়সা ভিক্ষার জন্য ওদের কান্নাকাটির সঙ্গে চিৎকার আর আশীর্বাদের বহর দেখে।

রেলওয়ে পুল ধরে ও নামছিল, এমন সময় হুসহুস ক'রে একখানা ট্রেন নীচ দিয়ে অতিক্রম ক'রে গিয়ে সশব্দে একটু দূরে টিনের ছাউনি দেওয়া প্লাটফরমটার সামনে দাঁড়াল। ঝিমিয়ে-পড়া গোলবাগের আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ ক'রে সঙ্গে সঙ্গে জনতার এক উল্লসিত চিৎকার উঠল। প্লাটফরমে সবাই ভিড় ক'রে এগিয়ে গেল ট্রেনের দিকে। মুখে তাদের এক আওয়াজ:

'মহাত্মা-গান্ধীজী কা জয়!'

'মহাত্মা-গান্ধীজী কী জয়!'

বখা রেলওয়ে পুল পার হয়ে প্লাটফরমের উপর এসে দাঁড়াল, ইঞ্জিনের একরাশ ধোঁয়া নাকে-মুখে ওর ঢুকে পড়েছিল। চোখ দু'টি একবার কচলে নিয়ে ও দেখল গোলবাগের ক্রীকেট খেলার মাঠের দিকে ধোপদুরস্ত জামা-কাপড়-পরা হাজার হাজার লোক চলেছে! বিপুল জনসমুদ্রের দিকে

বখা তাকাল চোখ তুলে। ধুপধাপ ক'রে সশব্দে সিঁড়ি বেয়ে একদল লোক ছুটে গেল ওদিকে। বখা শুনতে পেল ওরা বলছে :

'মহাত্মা এসে গেছেন রে—এসে গেছেন !'

কে যেন চিৎকার ক'রে বলে উঠল :

'গোলবাগের ক্রীকেট মাঠে আজ এক সভা হবে। মাহাত্মা গান্ধী বক্তৃতা দেবেন সেখানে।'…

তাই শুনে দলে দলে পথচারীরা অমনি ছুটতে লাগল গোলবাগের দিকে। 'মহাত্মা'র নাম শুনেই বুঝি সবাই ছুটছে অন্ধের মত। ঐ নামটা ওর কাছে কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হয়। ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে ও এগিয়ে চলে ওর পায়েদ ভারী বুটের শব্দ করতে করতে। ও যে ধাঙড় এবং সত্যি সত্যি ও যে আশেপাশের অনেকজনকে ছুঁয়ে দিয়েছে, একবারও ওর খেয়ালও হলো না। হাতে ওর কোন ঝাড়ু কিংবা ঝুড়ি নেই। ও যে একজন অচ্ছুত-ধাঙড় দেখে বোঝবার জো নেই। আশেপাশে ব্যস্ত মুখর জনতাও তা লক্ষ্য করলে না। সবাই ছুটে চলেছে গোলবাগের দিকে।

রেলওয়ে পুলের নীচে মোটর বাসের স্ট্যাণ্ড। ওখান থেকে গোলবাগের মুখ মুখ পর্যন্ত কাতারে কাতারে হাজারে হাজারে জনতার ভিড় দেখে মনে হয় ওটা যেন রীতিমত ঘোড়-দৌড়ের মাঠ। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে নর-নারী ছেলে-পিলের দল সবাই ছুটছে মাঠের দিকে। তার মধ্যে আছে বুলাশা শহরের ব্যবসাদার হিন্দু লালারা, সুশ্রী সুবেশ চটকদার পোষাক-পরা শিখেরা, স্থানায় গালিচা কারখানার কাশ্মীরী মুসলমানরা; আশেপাশের গাঁয়ের শিখ চাষা-ভুষারাও ছুটে চলেছে। ওদের কারো হাতে লোহার পাটি; কারো পিঠে বাজারের পুঁটলি, সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসী নেতা আব্দুল গফ্ফর খাঁর চেলা সেই বিরাট পাঠানরাও এসেছে। এসেছে 'স্যালভেশন আর্মী'র বস্তির কালো কালো সেই ভারতীয় খ্রীষ্টান মেয়েরা—পরনে তাদের রঙচঙে খাটো খাটো স্কার্ট ব্লাউজ আর ওড়না। তাদের অচ্ছুত পল্লী থেকেও এসেছে অনেকে। বখাকে

দেখে চিনতে পারল অনেকে। অপর সকলের মত একজন ইংরেজও এসেছে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর প্রতি নিজের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। জনসমুদ্রের কেউ কাউকে কোন প্রশ্ন করছে না, কেউ জিজ্ঞেস করছে না, তুমি চললে কোথায়। সবাই পরস্পর পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে আপন লক্ষ্য পথে।

কেল্লা সড়কটার যেন আর শেষ নেই। লোক গিসগিস করছে, পা ফেলবার জো নেই। গোলবাগের এক কোণের দিকে মিউনিসিপ্যালিটির নর্দমার জল চুইয়ে পড়ে খানিক জলাভূমির মত হয়েছিল। বখা তাড়া-খাওয়া দামড়া বাছুরের মত একলাফে ওই ডোবাটুকু পেরিয়ে পড়ল পাশের বাগানের মধ্যে। দু'পায়ে মাড়িয়ে একাকার ক'রে দিল মিষ্টি মটর আর ফুলের কচি কচি চারাগুলোকে। বখার দেখাদেখি পেছনের অতগুলি লোকও একে একে লাফিয়ে পড়তে লাগল বাগানের মধ্যে। দেখতে না দেখতে অমন সুন্দর বাগানটা যে একেবারে নষ্ট হয়ে গেল, তা কেউ একবার ভ্রূক্ষেপও করল না।

বাগানের পেছন দিকটায় ক্রীকেট মাঠের মধ্যখানে তখন হাজারে হাজারে লোক এসে জমায়েৎ হয়েছে। সেই বিপুল জনসমুদ্র থেকে চাপা উত্তেজনা, অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি থেকে থেকে উদ্বেলিত হয়ে উঠছে আর মাঝে মাঝে তা ফেটে পড়ছে গান্ধীজীর জয়ধ্বনিতে। ক্রীকেট মাঠের কাছাকাছি এসে ও পাশের একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। বখার অদম্য আগ্রহ ও উদ্দীপনায় ভাঁটা না পড়লেও মনে মনে তবু ও কেমন যেন দমে যায়। কেমন যেন খাপছাড়া, বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র বলে মনে হয় নিজেকে। সুশ্রী সুবেশ জনতার পাশে গু-মুত ঘাঁটা তার থাঁকী পোষাকটা অত্যন্ত বিশ্রী, বেমানান ঠেকে। তার সঙ্গে :এ-জনতার কি বিরাট তফাত, জাতি আর বর্ণের কি দুস্তর ব্যবধান! ব্যাপারটা ও বুঝেও যেন ঠিক বুঝতে পারে না। অনেকটা হেঁয়ালীর মত ওর মনে হয়, গান্ধীজীই বুঝি ঘোচাবে এই দুস্তর ব্যবধানের বেড়াজাল—হাত ধরে ওকে নিয়ে যাবেন ওদের কাছে। উন্মুখ হয়ে বখা অপেক্ষা করতে থাকে গান্ধীজীর।

সত্যি গান্ধীজী সম্বন্ধে ওর আগ্রহ কিংবা ঔৎসুক্যের অভাব ঘটে নি কোনদিন। কত কথাই না ও শুনেছে গান্ধীজী সম্পর্কে। লোকে ব'লে বেড়ায়ঃ তিনি হলেন এক মহাপুরুষ—স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু আর কৃষ্ণের অবতার। সেদিন ও বাবুদের পাড়ায় শুনেছিল, এক মাকড়সা নাকি দিল্লীর লাটসাহেবের খাস কুঠিতে ঢুকে পড়ে দেয়ালে এই মহাপুরুষের এক মূর্তি আঁকছিল জাল বুনে বুনে! পরিষ্কার ইংরেজী হরফে নামও তাঁর লিখে দেয় নীচে। মাকড়সার জাল বোনাটার তাৎপর্য নাকি অনেক। সাহেবদের হুঁশিয়ার ক'রে নাকি তাতে বলা হয়েছে, আর কেন, হিন্দুস্থান থেকে এবার তোমরা পাততাড়ি গোটাও। স্বয়ং ভগবানই নাকি মাকড়সার বাহন হয়ে জানিয়ে দিয়েছেনঃ 'গান্ধীজীই এবার থেকে সমগ্র হিন্দুস্থানের মহারাজ হবে।' লাটসাহেবের কুঠিতে মাকড়সার জাল হলো তারই জলন্ত প্রতীক। শুধু তাই নয়, বাবুরা আরও সব বলছিল যে, দুনিয়ায় এমন কোন তলোয়ার নেই যা গান্ধীজীর গায়ে খোঁচা দিয়ে ফুটতে পারে, এমন কোন গুলী গোলা নেই যা তাঁর গায়ে বেঁধে, এমন কোন আগুনও নেই যা তাঁকে দগ্ধ করতে পারে!

বখার পাশে জনৈক লালা দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলে উঠলঃ

'সরকার গান্ধীজীকে রীতিমত ভয় ক'রে চলেন। বুলাশা শহরে আসা সম্পর্কে তাঁর উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন।'

'ও-সব বাজে কথা! সরকার তাঁকে বিনা শর্তেই জেল থেকে মুক্তি দিয়েছেন।' পাশের এক বাবু ফস্ ক'রে ফোড়ন দিয়ে বলে ওঠে নিজের কাগজী-বিদ্যার বিজ্ঞাপন দেবার উৎকট বাসনায়।

'হ্যাঁ, বাবু, সরকারকে উনি উৎখাত করতে চান নাকি?' এক গোয়ো-চাষী প্রশ্ন করল তাকে।

'সে-শক্তিও তাঁর আছে হে আছে! ইচ্ছে করলে গোটা দুনিয়াটা সুদ্ধ তিনি পালটে দিতে পারেন!' এই বলে সেই বাবুটি তখন গান্ধীজী সম্পর্কে

সেদিনকার "ট্রিবিউন" পত্রিকার গোটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধটা বকবক ক'রে আউড়ে গেলেন :

'বৃটিশ সরকার তো কোন্ ছাড়! রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা শিল্প-জগতে ইয়োরোপ আর আমেরিকার প্রত্যেকটি দেশে আজ প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। বিলাতের 'অঙ্গরেজ লোকেরা' স্বভাবতঃ রক্ষণশীল। তবু এই সংকটের হাত থেকে তারা নিষ্কৃতি পাবে না, যদি না পাশ্চাত্য দেশগুলি তাদের মূল নৈতিক কিংবা মানসিক দৃষ্টিকোণ বদলায়। আমূল পরিবর্তন সাধিত না হলে পাশ্চাত্য সভ্যতার কিছুতেই নিস্তার নেই।·· কিন্তু ভারতীয় কৃষ্টি নরনারী নির্বিশেষে সকলকে এই শিক্ষা দিয়ে আসছে, মিথ্যা মরীচিকার মত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির পিছু পিছু ঘুরো না; স্বধর্ম অনুশীলন করতে থাকো। সিগারেট কিংবা সিনেমা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় তৃপ্তির পথে মোক্ষম কোন আনন্দ নেই।···আধুনিক জগতের সম্মুখে গান্ধীজীই ভারতের এই আধ্যাত্মিক মতবাদ তুলে ধরবেন। জগতকে তিনি শিক্ষা দেবেন : ভগবৎ প্রেমের সঠিক ধর্ম। তাই হবে শ্রেষ্ঠ 'স্বরাজ'।···'

'বাপরে! কি বুদ্ধি, কি পণ্ডিত বাবুটি!' চাষাটি ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে বাবুটির দিকে। কথা বলছে না, যেন তুবড়ীর খৈ ছুটছে! বক্তৃতা শুনতে শুনতে তার কেমন যেন ধাঁধা লাগে। গান্ধীজীর নামই তার কাছে সত্যি এক অলৌকিক রহস্যময় বলে মনে হয়। গত চৌদ্দ বছর থেকে সে শুনে আসছে কৃষ্ণজী মহারাজের অবতার গুরু নানকের মত মহাত্মাও এক সিদ্ধ মহাপুরুষ।··সে তার গিন্নীর মুখে আরও শুনেছিল, কত অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ, অলৌকিক কত কীর্তিকলাপ তিনি বলে করতে পারেন! তিলকে তাল বানাতে পারেন। দেবতার এক মন্দিরে গান্ধীজীকে একবার রাত্রি যাপন করতে হয়েছিল। বিগ্রহের দিকে পা দিয়ে গান্ধীজী বলে শুয়ে ছিলেন। মন্দিরের পুরোহিত তা দেখতে পেয়ে তাঁকে ভৎর্সনা করতে থাকে। বলে : ইচ্ছে ক'রেই গান্ধীজী ঠাকুরের দিকে পা দিয়ে শুয়েছে।' তিনি তখন

জবাব দেন: আচ্ছা ঠাকুর মশাই, বলতে পারেন দেবতা কোন্ দিকে নেই? মন্দিরের পুরোহিত তখন করলে কি, গান্ধীজীর পা দুটোকে বিপরীত দিকে সরিয়ে দিল। কিন্তু কি তাজ্জব ব্যাপার, দেখতে না দেখতে মন্দিরের বিগ্রহটাও পূর্বস্থান থেকে সরে গিয়ে গান্ধীজী যে দিকে পা দিয়ে শুয়েছেন সে-দিকে চলে আসেন। কাহিনীটা শোনার পর থেকেই না গান্ধীজীকে একবার দেখবার জন্য সে ঘুরে বেড়াচ্ছে পইপই ক'রে। আর তার গিন্নী তো গান্ধী মহাপুরুষের একবার পদধূলি নেবার জন্য রীতিমত পাগল হয়ে গেছে। যাক্, গিন্নী সঙ্গে না এসে ভালোই হয়েছে। এলে ছেলে-পিলেরাও আসত। এই ভিড়ের মধ্যে ওদের নিয়ে মহা বিপদে পড়তে হতো। ভাগ্যিস, আজকেই সে গাঁ থেকে সওদা করতে এসেছিল শহরে—চাষাটি ভাবতে থাকে আপন মনে।

বখা বাবুর কথাগুলি শুনছিল মন দিয়ে। সবটা বুঝে উঠতে না পারলেও মোটামুটি কিছুটা সে আন্দাজ ক'রে নিল।

'আচ্ছা বাবু, বলেন তো ফিরিঙ্গীরা সব দেশ ছেড়ে চলে গেলে উনি কি আমাদের গাঁয়ের খালগুলোর তদারক করবেন?' গাঁয়ের চাষীটিকে হঠাৎ প্রশ্ন করতে শুনল বখা। গান্ধীজী সম্পর্কে তার কৌতূহল ক্রমশঃ বেড়ে ওঠে।

'ভাইজী, আরে, জান না বুঝি,' খালের নাম শুনে বাবু লোকটি অমনি ফস্ ক'রে বলে উঠলেন: 'বাবু রাধাকুমুদ মুখার্জি বলেন, যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার চার হাজার বছর পূর্বেও প্রাচীন ভারতে পয়ঃপ্রণালীর অভাব ছিল না। ওই যে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডটা দেখছো, ওটাই বা কে তৈরী করল, ইংরেজরা বুঝি?'

'কিন্তু আমাদের মামলা-মোকর্দমাগুলো নিয়ে কি করা যাবে?' জাট্ চাষীটি আবার প্রশ্ন করে: 'গাঁয়ের মাতব্বর ব্যক্তিরা পঞ্চায়েতে গেলে পর আমাদের মত গরীব লোকদের কোন সুবিচার পাবার আশা নেই। ওঁরা যাদের দেখতে পান না সে-সব শত্রুদের উপর একহাত নিতে ছাড়েন না। এদিকে গান্ধীজী নাকি বলেছেন, সরকারী আদালতে না গিয়ে পঞ্চায়েতের সালিসী মেনে নিতে।'

'ভালো পঞ্চায়েত হলে তো কথাই নেই। গাঁয়ের কত উন্নতিই না করা যায়।' বিদ্যা দিগ্‌গজ বাবুটি জবাব দেন সঙ্গে সঙ্গে : 'এখন অবশ্য ভালো একটি পঞ্চায়তের সাক্ষাৎ মেলা ভার। কিন্তু অতীতে এমন ছিল না। প্রাচীর নির্মাণ বলো, সড়ক প্রস্তুত করা বলো, জনহিতকর কত কাজ— জনসাধারণের কত মঙ্গল না সাধিত হয়েছে ঐ গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলো দিয়ে।'

জাট্‌ চাষী কিংবা বখা কেউ বাবু লোকটির অত সব বড় বড় কথা ঠিক বুঝতে পারল না। জাট চাষীটির মুখে গাঁয়ের গরীব লোকদের কথা শুনে বখার নিজেদের ছোটলোক অচ্ছুতদের কথা মনে পড়ে যায়। ভাঙ্গি আর চামারদের জন্য গান্ধীজী অনশন শুরু করবেন এ-খবরটা সে যেন কোথায় কার মুখে শুনেছিল। আচ্ছা, খালি উপোস করলে তাদের মত গরীব লোকদের কি ফায়দাটা হবে?—বখা প্রশ্ন করে নিজেকে। তারা যে খেতে পায় না এবং ভালো খেতে না পেয়েও তারা যে বেঁচে আছে, গান্ধীজী কি নিজে তাই প্রমাণ করেছেন?...

বখার চিন্তাসূত্রে ছেদ পড়ে সহসা। বাবু লোকটির কথাবার্তা শুনে এক লালা কোথা থেকে এগিয়ে এসে বলে ওঠে :

'আমাদের সাধ্যে যা কুলোয় তা আমরা করব। ম্যানচেষ্টারের বিলিতী কাপড় আমরা এখনই বয়কট করতে রাজী আছি কিন্তু প্রতিশ্রুতি চাই স্বদেশী মিলগুলো আমাদের একচেটিয়া হবে। শুনছি গান্ধীজী নাকি জাপানের সঙ্গে কাপড় চালান নিয়ে এক চুক্তি করছেন।'

এমন সময় এক কংগ্রেসী ভলান্টিয়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। শুনতে পেয়ে বলে উঠল : 'কোন স্বদেশী বা আইন অমান্য আন্দোলন নিয়ে গান্ধীজী কিছু বলবেন না। হরিজনদের জন্য শুধু প্রচারকার্য করবেন এই শর্তে তিনি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন।'

'হরিজন!' কথাটা ও যে ইতিপূর্বে শোনেনি এমন নয়। তবু ওর কেমন যেন খটকা লাগে। রহস্যময় বলে মনে হয়।...ওর মনে পড়ে মাসখানেক আগে

জনকয়েক কংগ্রেস কর্মী ওদের বস্তিতে একবার এসেছিল। ওদের উদ্দেশ্য ক'রে বলেছিল, হিন্দুদের থেকে তারা আলাদা নয়। তাদের ছুঁলে পর কারো জাত যায় না, অপবিত্র হয় না কিছুই। কংগ্রেস ভলান্টিয়ারের কথা কয়টি মনে তার তুমুল ঝড় তোলে। সভায় এসে সে ভালোই করেছে। গান্ধীজী ছোটা, রামচরণ, ওর বাবা কিংবা ওর মত ভাঙ্গি চামার অচ্ছুতদের সম্বন্ধে অনেক কিছু হয়ত বলবেন। কে জানে, কি বলবেন নতুন কথা। 'স্যালভেশান আর্মী'র পাদ্রীটি তো বলছিল, ধনী আর দরিদ্র, ব্রাহ্মণ আর ভাঙ্গির মধ্যে কোন তফাত নেই—একই সমান সকলে। মহাত্মা গান্ধী এমন কি আর নতুন কথা বলবেন? তবু এখানে এসে ভালোই হলো। বখা ভাবতে থাকে আপন মনে। হাজার প্রশ্ন মনে ওর ভিড় ক'রে আসে।...চিন্তাসূত্র ছিন্ন ক'রে হঠাৎ সহস্র কণ্ঠের সমবেত জয়ধ্বনি ওঠে:

'মহাত্মা গান্ধী কি জয়।'

চমকে উঠে ও গোলবাগের ফটকের দিকে তাকায়, দেখে একখানা মোটর এসে থেমেছে তার সামনে, আর হাজারে হাজারে লোক ছুটে গিয়ে ঘিরে ধরেছে গাড়ীখানা। ও-ও ছুটে যাবে, না দাঁড়িয়ে থাকবে বুঝে উঠতে পারল না। না, না-যাওয়াটাই ভালো। ঠেলাঠেলি ক'রে ভিড়ের মধ্যে যাবার সময় কাউকে হয়ত ছুঁয়ে দেবে, তারপর বিশ্রী একটা কাণ্ড হয়ত ঘটে বসবে। অত লোকের মধ্যে গান্ধীজী ছুটে এসে ওকে রক্ষা করতেও পারবেন না। একটু ইতস্তত ক'রে বখা তাকাল মাথার উপরকার গাছটার দিকে। বানরের মত অনেকগুলো লোক গাছটায় চড়ে নিজেদের আসন ক'রে নিয়েছে তার ঘন ডালপালার মধ্যে। পায়ের বুট জুতোটার জন্য একটু বেগ পেতে হলো, তবুও গাছটায় ও চড়ে বসল কোনরকমে।

'মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়!' 'হিন্দু-মুসলমান-শিখ কি জয়!' 'হরিজন কি জয়!' ইত্যাদি নানান আওয়াজ তুলে বিপুল জনতা তখন গান্ধীজীকে নিয়ে চলল মঞ্চের দিকে। শাদা ধবধবে একখানা মোটা চাদর গান্ধীজীর গায়ে।

মুণ্ডিত মস্তক প্রশস্ত ললাট, কান দু'টি চেপ্টা—একটু বড়, নাকটিও দীর্ঘ। তার উপর একজোড়া চশমা। পাতলা ঠোঁট দুটিতে প্রশান্ত হাসি লেগে আছে, আর দন্তহীন লম্বা মুখখানির নীচে চেরা ছোট চিবুকটা জীবনের অটুট প্রতিশ্রুতির সাক্ষ্য বহন ক'রে চলেছে। সব কিছু মিলে ঈষৎ খবাকার এই লোকটির মুখখানা থেকে কেমন এক প্রশান্ত সৌন্দর্যদীপ্তি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। বথার মাথাটা শ্রদ্ধাভরে আপনা থেকে নত হয়ে আসে।

গান্ধীজীর পাশে দুইজন মহিলা বসেছিলেন। একজন ভারতীয় আর একজন ইংরেজ। বথার পাশে গাছের ডাল ধরে স্কুলের যে ছেলেটি বসেছিল, সে তার বন্ধুকে শুনিয়ে বললে :

'জানিস, উনি হলেন শ্রীমতী কস্তুরাবাঈ গান্ধী—মহাত্মা গান্ধীর স্ত্রী।'

'আর ওপাশের ওই ইংরেজ মহিলাটি কে রে?' বন্ধুটি প্রশ্ন করল।

'গান্ধীজীর ইংরেজ শিষ্যা মিস্ স্ল্যাডি মীরাবেন। উনি একজন ইংরেজ নৌ সেনাপতির মেয়ে।'

তার চোখ গিয়ে পড়ে একসময় রাস্তার কিছু দূরে খাকী-পোষাক পরা ইংরেজ পুলিস সুপারিন্টেণ্ডের উপর। চক্‌চকে সুন্দর টুপীপরা খাস বিলিতী সাহেবের দিকে চোখ তুলে তাকাতে বথার আজ আর ইচ্ছা হলো না। ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রতীক ইংরেজ-পুলিস কর্মচারীর উপর থেকে বথার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে গান্ধীজীর উপর। গান্ধীজীর উপরই চোখ-দু'টি ওর পড়ে থাকে।

কংগ্রেস ভলান্টিয়ারদের সকল বাধা উপেক্ষা ক'রে নর-নারী নির্বিশেষে সবাই গান্ধীজীর পদধূলি নিতে কাড়াকাড়ি শুরু ক'রে দেয়। তাই দেখে ও বিড়বিড় করে আপন মনে : 'আরে, গান্ধীজীও দেখছি আমার মত কালা আদমী! তবে হ্যাঁ, লেখাপড়া নিশ্চয় করেছেন অনেকখানি।'

গোলবাগের সন্ধ্যার স্তব্ধ হিমে আকাশ বিদীর্ণ ক'রে এবার সমবেত সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনি ওঠে : 'মহাত্মা গান্ধীজীকি জয়!' মহাত্মা তখন সুসজ্জিত কংগ্রেস মঞ্চের উপর উঠে উপাসনা রত ভঙ্গিতে চোখ বুজে দাঁড়িয়েছেন করজোড়ে।

মুখে তাঁর শিশুর মত প্রশান্ত হাসি। একটু পরেই উদ্বোধন সংগীত শুরু হলো। সমস্ত দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা, বিসদৃশ সব ঘটনা, শহরের রাস্তার সেই ক্রুদ্ধ লোকটা, নাট-মন্দিরের পুরুতঠাকুর, স্যাকরা-পাড়ার সেই দজ্জাল গিন্নী, ছোটা, রামচরণ, তার বাপ, পাদ্রী সাহেব আর তার মেমসাহেব—সব কিছুর স্মৃতি মুছে যায় বথার মন থেকে। সভার উদ্বোধন সংগীতটি তখনও ওর কানে অনুরণিত হতে থাকে :

…রাত হলো শেষ, ওঠ জাগো—
ওরে যাত্রী, আর কতকাল ঘুমিয়ে রইবি বল '

সমবেত বিরাট জনসমুদ্রের কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই, মন্ত্রমুগ্ধের মত সবাই নিশ্চুপ হয়ে শুনছে। গান্ধীজী তখনও করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখের সেই হাসিটি লেগে আছে তখনও। উদ্বোধন সংগীত সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে লাউড স্পীকারের মারফত গান্ধীজীর কণ্ঠ ভেসে এল :

'প্রায়শ্চিত্তের এক কঠোর অগ্নিপরীক্ষা সেরে আমি বাইরে এসেছি। যাদের জন্য আমার এই প্রায়শ্চিত্ত, তারা আমার এই জীবনের চাইতেও প্রিয়।' গান্ধীজী প্রত্যেকটি কথা মেপে মেপে যেন নিজেকে নিজে বলে চললেন : 'যাদের জন্য আমার এই প্রায়শ্চিত্ত তারা আমার প্রাণের চাইতেও প্রিয়। বৃটিশ সরকার এখনও তাদের পৃথক ক'রে শাসন করার নীতি অনুসরণ ক'রে চলেছে। তাই দেশের নতুন শাসনতন্ত্রে আমাদের অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভাইদের জন্য পৃথক নির্বাচন আসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নতুন শাসনতন্ত্র গঠনে আমলাতন্ত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা করছেন কিনা আমার জানা নেই। এ সম্পর্কে আমি কিছু বলতেও চাই না। সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রচারকার্য করা হবে না এই শর্তে আমি কারবার থেকে মুক্তি লাভ করেছি। সুতরাং ওই নিয়ে আমি আপনাদের কিছু বলব না। তথা-কথিত অচ্ছুত সম্প্রদায়ের কথাই আমি আজ বিশেষ ক'রে বলব। আইন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার সম্প্রতি এঁদের স্বতন্ত্র অধিকার দান করছেন।

হিন্দুধর্ম থেকে এঁদের সকলকে পৃথক ক'রে রাখবার ক্রূর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।...

'আপনারা সকলে জানেন, বৈদেশিক শাসকদের কবল থেকে আমরা সবাই আজ স্বাধীনতা চাই। কিন্তু আমরা নিজেরাই শত শত বৎসর ধরে এতদিন আমাদের অনুন্নত কোটি কোটি ভাই-বোনদের উপেক্ষিত, পদদলিত, বঞ্চিত ক'রে রেখেছি। এই অন্যায় অবিচারের জন্য এতটুকুও আমাদের গ্লানি কিংবা অনুতাপ হয় নি। প্রশ্নটা আমার কাছে কেবল নৈতিক নয়, ধর্মগতও। আপনার বিবেকের তাড়নায় আমি সম্প্রতি এঁদের হয়ে আমরণ অনশন ব্রত শুরু করেছিলাম।'

বধা বক্তৃতার অনেকগুলি কথা বুঝে উঠতে পারল না। ও ব্যস্ত হয়ে উঠল। যে-ভাষা ওরা বুঝতে পারে না এমন ভাষায় মহাত্মা বক্তৃতা দিচ্ছেন কেন?— প্রশ্ন করে ও নিজেকে। গান্ধীজী বুঝি ওর মনের কথা বুঝতে পেরে এবার বলে উঠলেন :

'অস্পৃশ্যতাকে আমি সনাতন হিন্দুধর্মের সর্বাপেক্ষা কলঙ্ক বলে মনে করি। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখনই আমার মনে এই ধারণার উদয় হয়।'

বধার কান দুটো খাড়া হয়ে ওঠে। একান্তভাবে ও জমে যায় বক্তৃতায়। গান্ধীজী তখন বলে চলেছেন :

'এই ধারণা আমার মনে যখন উদয় হয় আমার বয়স তখন বছর বারো মাত্র। একজন অস্পৃশ্য মেথর ঝাড়ুদার আমাদের বাড়ি এসে রোজ পায়খানা পরিষ্কার করত, তার নাম ছিল উকা। ওকে ছুঁতে আমার মা বারণ করতেন। ওকে ছুঁতে নেই কেন, আমি বার বার শুধাতাম মাকে। দৈবাৎ ওকে কোনদিন ছুয়ে বসলে আমায় স্নান ক'রে গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ হতে হতো। যদিও এইসব নিয়ম-কানুন আমায় মেনে চলতে হতো তবু প্রতিবাদ না ক'রে আমি ছাড়তাম না। বলতাম হিন্দুশাস্ত্রের কোথাও অস্পৃশ্যতার উল্লেখ নেই। ছেলে হিসেবে আমি অত্যন্ত বাধ্য ও কর্তব্যপরায়ণ ছিলাম। পিতা-মাতার প্রতি উপযুক্ত

সম্মান আর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পরাঙ্মুখ ছিলাম না। তবু তাদের সঙ্গে আমি অনেক সময় এ নিয়ে কথা কাটাকাটি ও তর্ক করতাম। উকাকে ছুঁলে পাপ হয় বলে মা যখন বলতেন, আমি তার প্রতিবাদ করতাম। বলতাম কাউকে ছুলে পাপ নেই।...

'স্কুলে যাবার সময় আমি অনেক সময় অচ্ছুতদের ছুঁয়ে দিতাম। বাবা আর মার কাছে কাজটা গোপন রাখতাম না বলে শুদ্ধি হওয়ার নতুন একটা সোজা পথ তাঁরা আমায় বাতলে দিলেন। বললেন, অচ্ছুতদের কাউকে ছুঁয়ে কোন মুসলমানকে ছুঁয়ে ফেললে ছোঁয়াছুঁয়ির পাটটা নাকি কাটাকাটি হয়ে যায়। ঘটা ক'রে আর শুদ্ধির আয়োজন করতে হয় না। মাকে আমি অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা করতাম। তাঁর নির্দেশ অনাশ্য না করলেও অস্পৃশ্যতাকে ধর্মের অমোঘ বিধান বলে কোনদিন মেনে নিতাম না।...'

গান্ধীজীর বক্তৃতা শুনতে শুনতে নিজেকে ঝাড়ুদার উকা বলে মনে হয় বখার। আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে ও। বক্তৃতার খেই যেন হারিয়ে ফেলে। তারপর হঠাৎ চমকে উঠে ও কান খাড়া ক'রে আবার বক্তৃতা শুনতে থাকে।

'সে-বার জাতীয় দিবসের দিন আমি তখন নেলোরে ছিলাম, হরিজনদের সঙ্গে সেখানেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। সেদিনও আমি আজকের মত প্রার্থনা করছিলাম। প্রার্থনা করছিলাম, পরজন্মে আমি যেন অস্পৃশ্য অচ্ছুত হয়েই জন্মাতে পারি। যেন অংশ গ্রহণ করতে পারি অচ্ছুতদের সকল দুঃখ-দুর্দশা আর অপমানের গুরুভারের। তাদেরই মতই একজন হয়ে সকল দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে যেন দিতে পারি মুক্তির সন্ধান। তাই আমি প্রার্থনা করছিলাম, আমাকে যদি পরজন্ম গ্রহণ করতে হয়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিংবা শূদ্রের ঘরে আমি যেন জন্মগ্রহণ না করি। অস্পৃশ্য অচ্ছুত হয়েই যেন জন্মাই।'...

'মেথরের কাজ করতে আমিও ভালোবাসি। আমাদের আশ্রমে বছর আঠার বয়সের এক ব্রাহ্মণ সন্তান নিজেই মেথরের কাজ ক'রে থাকে। ছেলেটিকে আপনারা কোন সংস্কারবাদী বলে মনে করবেন না। 'গোঁড়া হিন্দুধর্মের

জারকরসে জারিত সে, নিয়মিত সে গীতাপাঠ ক'রে থাকে। পূজা-আর্চাও করে ভক্তিভরে। কিন্তু সে মনে করে, আশ্রমদের ধাঙড় আর মেথরদের কোন মঙ্গল করতে হলে মেথরের কাজ তাকেও করতে হবে। নিজে আচরণ না ক'রে অপর কারো মঙ্গল বিধান সম্ভব নয়।'

শুনতে শুনতে বথার সর্বাঙ্গ সিউবে ওঠে। মহাত্মা নিজে ধাঙড় হয়ে জন্মাতে চান! বলেন কি! নিজেও তিনি ধাঙড়-মেথরের কাজ ক'রে থাকেন! তাঁকে ওঁর ভালো লাগে। নিজেকে ও তাঁর হাতে স'পে দিতে পারলে এবং তাঁর কোন কাজে এলে যেন স্বস্তি বোধ করে। অসাধ্য এমন কিছু নেই যা মহাত্মার জন্য ও করতে প্রস্তুত নয়। মহাত্মার আশ্রমে ও চলে যাবে। ঝাড়ুদার হবে ওখানে গিয়ে। চব্বিশ ঘণ্টা তাহলে সাক্ষাৎ মিলবে তাঁর সঙ্গে। কথা বলতে পারবে। আরে, ও ভাবছে কি সব! বথা শুধায় নিজেকে। বক্তৃতা যে এদিকে কিছুই শোনা হচ্ছে না। ও আবার সজাগ হয়ে ওঠে।

'এখানে যদি কোন অচ্ছুত থাকে, তারা জেনে রাখুক, তারাই ঝেঁটিয়ে হিন্দু-সমাজের জঞ্জাল পরিষ্কার ক'রে থাকে।'

ও যে একজন অচ্ছুত, হাঁক ছেড়ে ওর বলে উঠতে ইচ্ছা করে। কিন্তু হিন্দু সমাজের জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করাটা কি, ঠিক বুঝে উঠতে পারে না ও। বুকের মধ্যে ওর যেন ঢেঁকির পাড় পড়তে থাকে। কান দুটো খাড়া ক'রে আবার শুনতে থাকে। গান্ধীজী বলে চলেছেন: 'সুতরাং তাঁদের নিজেদেরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকা উচিত। এমনভাবে থাকতে হবে যাতে কেউ যেন তাদের খুঁত বার করতে না পাবে। আমি বলছি তাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা গাজা কিংবা সুরা পান ক'রে থাকেন। ওই সব অভ্যাস আজ থেকে বর্জন করতে হবে।...

'অচ্ছুতরা তো নিজেদের হিন্দু বলে দাবি করেন; শাস্ত্র মতে পূজা-আর্চাও ক'রে থাকেন। কিন্তু হিন্দুদের এইসব অত্যাচারের কথা হিন্দুশাস্ত্রের কোথাও কি লেখা আছে? হিন্দুধর্মের যারা ধারক আর বাহক, তারাই শুধু এর জন্য

দায়ী। নিজেদের মুক্তির সন্ধান পেতে হলে অচ্ছুতদের নিজেদের বদঅভ্যাসগুলি ছাড়তে হবে।'

আরে, গান্ধীজী তাদের গাল দিচ্ছেন নাকি? লক্ষণটা তো ভাল নয়। বক্তৃতার শেষ কথাগুলি ভুলে যাবার চেষ্টা করে বখা। মহাত্মার কাছে ছুটে গিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, কি অভিশপ্ত জীবনই না ওদের প্রতিদিন যাপন করতে হয়। এই শহরে ওর মত ধাঙড়দের খাবারের রুটি নিতে হয় কুড়িয়ে নোংরা নর্দমার মুখ থেকে। এখানকার শহরেই ওর ভাইকে সিপাইলোকদের এঁটো বাসন থেকে ঝুটা খাবার চেয়ে নিতে হয় খাওয়ার জন্য, যা কুকুরেও খায় না। ও মহাত্মার দিকে ফিরে তাকায়। তিনি বলে চলেছেন:

'আমি নিজেও একজন গোঁড়া হিন্দু। আমি জানি হিন্দুরা কেউ স্বভাবতঃ পাপাত্মা নয়। গভীর অজ্ঞানতার পঙ্কেই এখনো তারা ডুবে আছে। পাতকুয়ো, মন্দির, সড়ক, স্কুল কিংবা স্বাস্থ্যনিবাস প্রভৃতি সমুদয় বারোয়ারী প্রতিষ্ঠানের দ্বার অচ্ছুতদের জন্য আজ উন্মুক্ত ক'রে দিতে হবে। এবং আপনারা যদি আমাকে ভালোবাসেন তাহলে আজ থেকে এই শপথ নিন, ঘৃণ্য অস্পৃশ্যতা দূর করবার জন্য আপনারা শান্ত অহিংস নীতিতে প্রচারকার্য চালিয়ে যাবেন। অস্পৃশ্যদের মুক্তি আর গো-রক্ষাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। এই ব্রত পূর্ণ হলে তবে আমাদের 'স্বরাজ' আসবে। আমার জীবন সার্থক হবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনাদের ব্রত যেন পূর্ণ হয়।'

'মহাত্মা গান্ধীকি জয়!' 'হিন্দু-মুসলমান কি জয়।' 'হরিজন কি জয়!' প্রভৃতি বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে গান্ধীজী তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। বখা স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে গাছের উপর ডালে স্থির হয়ে বসে রইল। ওর নীচ দিয়ে অসংখ্য জনতার ভিড় ঠেলে মহাত্মা কখন বেরিয়ে গেলেন ও টেরও পেল না।

কিছু দূরে কাঠের এক মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে একজন পাঁড়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে জল বিতরণ করছিল। ভিড় থেকে একজন সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠল:

'মহাত্মাজী হিন্দু-মুসলমান সবাইকে এক ক'রে গেছেন ভাই।'

এক কংগ্রেস ভলান্টিয়ার ওদিক চিৎকার ক'রে বলছে :

'বিলিতী পোষাক ত্যাগ কর ভাই সব, পুড়িয়ে ফেল ওই সব।'

বখা অবাক হয়ে দেখল, কিছুক্ষণের মধ্যেই একরাশ বিলিতী কাপড়, জামা, টুপী, শার্ট স্তূপাকার হয়ে গেল। জনতা পরম আনন্দে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল।

বিপুল ভিড়ের মধ্যে এক ঘেসুড়ে বৌ তার দু'টি ছোট ছোট দামাল ছেলেকে সামলে উঠতে পারছিল না। ভিড় থেকে একজন এগিয়ে এল তার কাছে, বলল : 'দিদি, তোমার এক ছেলেকে আমার কোলে দাও। আমি পৌঁছে দিচ্ছি।'

'দুর দুর, গান্ধীজী হলো পয়লা নম্বরের বুজরুক।' ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল : 'আস্ত একটা গাধা, বকধার্মিক কোথাকার। এদিকে তো খুব উপদেশ দিয়ে গেলেন অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে হবে, অপরদিকে নিজেই নিজ-মুখে স্বীকার ক'রে গেলেন যে তিনি হলেন গোঁড়া হিন্দু। আমাদের এই গণতন্ত্রের যুগে তাঁর সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা মুশকিল। তিনি তাঁর স্বদেশী আর চরকা নিয়ে খ্রীষ্টপূর্ব সেই চতুর্থ শতাব্দীতেই বাস করছেন এখনও। এটা যেন বিংশ শতাব্দী নয়। আমি রুশো, হবস্, বেন্থাম আর জন স্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি মনীষীদের কত লেখাই—'

কালো ভালুকের মত বখা গাছ থেকে এবার নেমে পড়ল ঝপাং ক'রে। নিঃশব্দে কেটে পড়ছিল কিন্তু গাছ থেকে ওর নেমে পড়ার ধরণ দেখে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী সেই লোকটা বলে উঠল :

'এ—এ, কালা আদমী, আরে এদিকে আয় তো। সাহেবের জন্য গিয়ে একটা সোডা ওয়াটারের বোতল নিয়ে আসতে পারবি ?'

ডাক শুনে ফিরে তাকাল। দেখল, সুশ্রী-সুবেশ বিলিতী স্যুট-পরা এক ভদ্রলোক : বাঁ চোখে তাঁর এক ফ্রেমহীন চশমা। অমন চশমা বখা আগে

কোনদিন দেখে নি। হাঁ ক'রে ও তাকিয়ে রইল। হাবভাব আর কাপড়-চোপড় সবকিছু ভদ্রলোকের এমনই যে উনি খাঁটি সাহেব, না ভারতীয়, কথা চিনে ঠিক ঠাহর ক'রে উঠতে পারল না। অবাক হয়ে ও তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

'আরে, অমন হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছিস কি?' সাহেব ভদ্রলোকটি খেঁকিয়ে উঠল। তারপর সাহেবদের ঢঙে ইচ্ছে ক'রে ভুল হিন্দুস্থানীতে বলে উঠল: 'হাম সাহেব, বিলাত থেকে সবে ফিরা হ্যায়। সোডা বোতলের দোকান আশেপাশে কোথাও আছে বলনে পারেগা?'

বখা দিশী সাহেবটির প্রশ্ন শুনে রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিল। কোন জবাব না দিয়ে ও মাথা নাড়ল। ওর হয়ে পাশের এক যুবক জবাব দিলে:

'মহাত্মাকে ওভাবে গাল দেওয়া আপনার অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে!' যুবকটি এগিয়ে এলেন। মাথায় তার লম্বা একরাশ চুল, মুখখানা মেয়েলি ধাঁচের, বুদ্ধিদীপ্ত দু'টি চোখ, গায়ে ঢিলে পাঞ্জাবী। অনেকটা কবি-কবি ভাব।

দেখতে না-দেখতে কবি আর দিশী সাহেব দু'জনকে ঘিরে ছোটখাট একটা ভিড় জমে গেল। দিশী সাহেবটি বাধা দিয়ে বলে উঠল:

'ঠিক কথা, আমিও ঠিক তাই বলতে যাচ্ছিলাম। আমার মূল বক্তব্য হলো—'

'শুনুন, আমায় আগে বলতে দিন। আমার কথা এখনও শেষ হয় নি।' কবি বলে চলল: 'গান্ধীজীর গণ্ডী অবশ্য সীমাবদ্ধ। কিন্তু মূলে তাঁর কোথাও একচুল গলদ নেই। এই যুগে চরকাকে চালু করতে যাওয়া হয়ত তাঁর ভুল। ভারতবর্ষকে তাহলে গোটা দুনিয়া থেকে একঘরে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হবে। কিন্তু তা নিশ্চয় হবে না। তবু তিনি, তাঁর মতে, ঠিকই করছেন। ভারতবর্ষ যে আজ গরীব দেশ এবং গোটা দুনিয়াটাই যে ধনী এই দোষ কি বেচারী ভারতবর্ষের?...

'আরে মশাই, শ' পড়েছিলেন নাকি? তাঁরই মত যে খুব চোখা চোখা আপাত-বিরুদ্ধ কথা বলছেন?' একচক্ষু চশমা-পরা ভদ্রলোকটি টিপ্পনী কাটল।

'আবে রেখে দিন মশাই আপনার শ।' আমি আপনার মত ঘুণে-ধরা ভারতীয় যুবক নই যে ঐসব য়ুরোপীয় চিত্র-তারকাদের নিয়ে ফোপর-দালালী করব।' ছোকবা কবি জবাবটা ছুঁড়ে মারল। আবার বলল: 'আপনি নিশ্চয় জানেন, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করলে ভাবতবষ পৃথিবীব অন্য দেশেব তুলনায় পিছিয়ে পড়ে নেই। অফুরন্ত তার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য-সম্পদ। বাস্তবিক, এদিক থেকে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্য ধনী দেশগুলিব মত হলেও কলকারখানা যন্ত্রপাতি তার নেই। কৃষি-ভারত কৃষিই রয়ে গিয়েছে। তাই তো ভারতের আজ এই দুর্দশা। এই গলদ আমাদের দূর করতে হবে। যন্ত্রপাতিকে আমি মনে মনে রীতিমত ঘৃণা করি। বরদাস্ত করতে পারি না কিছুতেই। তবু বর্তমান ক্ষেত্রে আমি গান্ধীজীর অনুসৃত নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। যন্ত্রকেই আমিও নেব বরণ ক'রে। আজ আমাদেব গলায় যারা দাসত্বের জিঞ্জির পরিয়ে দিয়েছে তাদেব সকল অভিসন্ধি বেফাঁস ক'রে আমরা তখন—'

'আরে, ওসব বলছ কি ভাই, মিছিমিছি শ্রীঘরের দিকে পা বাড়াতে চাও নাকি?' ভিড়ের মধ্য থেকে কে যেন ফোড়ন দিয়ে উঠল।

'আব শ্রীঘর! গেল বছর যখন গ্রেফতারেব হিড়িক পড়ে গিয়েছিল—হাজারে হাজারে দেশের লোককে যখন নিয়ে গিয়ে জেলে পুরেছিল আমিও তখন ভাই বেশ কিছুদিনের জন্য অতিথি হয়েছিলাম আপনার ঐ শ্রীঘরেই!' কবি জবাব দিল।

'আপনি আছেন কোথায় মশাই, আপনার ঐ চাষাভূষোরা যারা এই পৃথিবীটাকে নিছক মায়াময় বলে মনে করে, তারা কি আপনার আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবে বলে ভাবছেন?' আত্মম্ভরী সেই দিশী সাহেবটি চোখে চশমা আঁটতে আঁটতে জবাব দিল কবির কথার।

'প্রত্যেকটি সামগ্রীকে সাদরে বরণ ক'রে নেওয়াই ভারতের মজ্জাগত আদর্শ। বিমুখ সে কাউকে করে না।' যুবক কবি উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে চলল: 'সম্পূর্ণ বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে যুগ যুগ ধরে এই বিপুল বিশ্বে প্রত্যেকটি

সম্বন্ধে প্রত্যেকটি উপাদানকে খাঁটি ধ্রুব সত্য বলে সে গ্রহণ ক'রে আসছে। আমাদের উপনিষদের মতে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, পুনর্জন্ম হয় তার—অমরত্ব লাভ ক'রেও জন্ম-জন্মান্তরের ধাঁধার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না সে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোন না কোন উপাদান হয়ে আবার তাকে জন্ম নিতে হয়। অন্য কোন জগৎকে আমরা বিশ্বাস করি না। একমাত্র শঙ্করাচার্য ছাড়া এই বিশ্বকে আর কোন ভারতীয়ই মায়া-প্রপঞ্চ বলে মনে করে না। কিন্তু তিনি ছিলেন অর্ধ-উন্মাদ—নিউরটিক। রোগে ভুগে ভুগে চিন্তা ছিল তাঁর অসুস্থ। প্রাচীন য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা মূল উপনিষদ সংগ্রহ করতে পারেন নি। তাই শঙ্করাচার্যের ভাষ্য থেকে ভারতীয় চিন্তাধারার তাঁরা ব্যাখ্যা করে গেছেন।... 'মায়া' শব্দের মূল তাৎপর্য হলো যাদু—মিথ্যা প্রপঞ্চ অলীক নয়। বেদান্ত দর্শনের সর্বশেষ ভারতীয় অনুবাদক ডক্টর কুমারস্বামী তাই ব্যাখ্যা করছেন। সুতরাং এদিক থেকে দেখতে গেলে আপনাদের প্রিয় বৈজ্ঞানিক এডিংটন কিংবা জিনস্-এর প্রাকৃতিক জগতের সমগোত্রীয় বলে মনে হয় তাঁকে। ভিক্টোরিয়া যুগের পণ্ডিতরা আমাদের আগাগোড়া ভুল ব্যাখ্যা ক'রেই গেছেন।' ..ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য-শাহী শাসন ও শোষণের আধ্যাত্মিক পটভূমি প্রস্তুত ক'রে তারপর চাতুরীর সঙ্গে ছোট্ট একটা উপকথা দিল তার সঙ্গে জুড়ে। বললে: 'মায়াময় এই পৃথিবীর সব কিছুই অলীক মিথ্যা। তোমরা তোমাদের দেশের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমাদের হাতে নির্বিঘ্নে সঁপে দিয়ে নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য চোখ বুজে জপতপ করতে থাক।...কিন্তু সেদিন আর নেই। বিপুল এই বিশ্বজগৎকে একদা আমরা সহজ সরলভাবে বরণ ক'রে নিয়েছিলাম। আমাদের সেই ঐতিহ্যের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে এবং ভারতীয় শিল্প আর স্থাপত্যের অমর কীর্তিকে পুরোধা ক'রে আমরা আজ যন্ত্র-যুগকেও সাদর সম্ভাষণ জানাব। কিন্তু তাই বলে বেসামাল হয়ে আমাদের নিজেদের সত্তা হারালে চলবে না। অর্থগৃধ্নু পাশ্চাত্য জগৎ আজ অর্থের সন্ধানে নিজেরাই বেসামাল হয়ে পড়েছে। ফিরে গেছে অসভ্য বর্বর যুগে। তাদের নির্বুদ্ধিতার কথা

আমাদের ভুললে চলবে না। ছয় হাজার বছরের পুরাতন আমাদের 'জাতি'-সচেতন সভ্যতা। জীবনকে আমরা জানি। জীবনের জলতরঙ্গের সঙ্গে চলতে হবে আমাদের খাপ খাইয়ে। ভুল করলে আমাদের চলবে না। আমরা জানতে চাই, শিখতে চাই আরও। কল-কারখানা যন্ত্রপাতির পাটও ক'রে যাব সুচারু-রূপে। যন্ত্রের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দেব না কিছুতেই। এই আস্থা আমাদের আছে এখনও।...'

বক্তৃতাটি বেশ জমে উঠেছিল। আশপাশের লোকজন সবাই চুপ হয়ে শুনছিল। যখা তখনও গান্ধীজীর বক্তৃতার কথা ভাবছিল। কবির বক্তৃতার প্রতি বিশেষ কান দেয় নি সে এতক্ষণ। সবটা সে বুঝতেও পারছিল না। ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন জিজ্ঞেস করল :

'লোকটি কে রে?'

'জানিস না, উনি হলেন কবি কুবলনাথ সারচার, "নওয়ান যুগ" পত্রিকার সম্পাদক। আর উনি যার সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি হলেন ব্যারিস্টার মিস্টার আর. এন. বসির, বি-এ (অক্সন)।' কে আর একজন জবাব দিল ভিড়ের মধ্য থেকে।

ভিড়ের মধ্য থেকে একটা চাপা ফিসফিস ধ্বনি ভেসে এল। মিষ্টার বসির তাকে ছাপিয়ে হা-হা ক'রে হেসে উঠল :

'কিন্তু আপনার লম্বা-চওড়া ঐ বক্তৃতার সঙ্গে অস্পৃশ্যতার সম্পর্ক কতটুকু বলুন তো? গান্ধীজীর সমস্ত ওজরটাই কি তাঁর "ইন্‌ফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স"-এর প্রতীক নয়? আমার মনে হয়—'

'হ্যাঁ, আমি জানি আপনার কি মনে হয়', কবি একটু চাপা হাসি হেসে বলল : 'আমি জানি আপনার কি মনে হয়। কিন্তু জেনে রাখবেন গান্ধীজী তাঁর অস্পৃশ্যতার ব্যাপারে রাজনৈতিক মতবাদের থেকে অধিক সচেতন। অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটিতে দু'পাতা পড়ে এসে 'ইন্‌ফিরিয়রিটি আর 'সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স' প্রভৃতি সস্তা বুলিগুলোই খালি শিখে এসেছেন।

মানেটা কবুল করতে শেখেন নি। সব কিছুতেই ইংরেজদের অন্ধের মত নকল করতে আপনার লজ্জা—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বাত!' একজন কংগ্রেস ভলান্টিয়ার সহসা ফোড়ন কেটে উঠল: 'গলায় সিল্কের টাই আর বিলিতি স্যুট পরে আছে, সত্যি কি লজ্জার কথা!'

'মানুষের বংশানুক্রমিক পদকৌলীন্য আর পরিবেশ এক নয়—বিভিন্ন রকমের।' কংগ্রেসওয়ালাকে থামিয়ে দিয়ে কবি বলে চলল: 'এই যেমন ধরুন, আমাদের কারো মাথা হয় প্রকাণ্ড, কারো বা ছোট; কারো বা গায়ে অসুরের মত জোর, কেউ বা দুর্বল। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে হয়ত কশ্চিৎ একজন সাধু-মহাপুরুষের সাক্ষাৎ মিলবে, হাজার লোকের মধ্যে হয়ত একজন প্রতিভাশালী মনীষীর হয় জন্ম। কিন্তু তাই বলে মানবতার দিকে থেকে সব মানুষই সমান নয় কেন! আমাদের দেশের এক চলতি কথায় কি বলে জানেন? চাষীর হাত থেকে লাঙ্গলটা কেড়ে নিয়ে ধুয়ে মুছে কাপড়-চোপড় পরিয়ে ওকে যদি রাজসিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সে রাজ্য ঠিক চালিয়ে যেতে পাববে! আমাদের গাঁয়ের চাষীদের সেই শক্তি আর সামর্থ্য এখনও রয়েছে। গাঁয়ের এক চাষীর কাছে যান না, দেখবেন সে কেমন বিনয় আর নম্রভাবে কথাবার্তা বলবে আপনার সঙ্গে। সব মানুষই সমান এই বোধ নতুন নয় ওর কাছে। সুচতুর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাদের বর্ণ-কৌলীন্যের গর্বে ফেঁপে উঠে হিন্দুশাস্ত্রের নতুন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিল। দ্রাবিড়দের শাস্ত্রমতের ভুল ব্যাখ্যা ক'রে বলল: মানুষের সুখ-দুঃখ সব কিছুই পূর্বজন্মের কর্মফল! ধূর্ত ব্রাহ্মণরা শাস্ত্রের এই অপব্যাখ্যা না করলে ভারতবর্ষেই পৃথিবীর সেরা আদর্শ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতো। গণতন্ত্রের কোন বালাই নেই—আপনি এই কথাই বা কি ক'রে বলেন? ব্রাহ্মণদের সৃষ্ট এই জাতিভেদ কি বৈদগ্ধ আভিজাত্য নয়? এই যেমন ধরুন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি একই পঙ্‌ক্তিতে বসে তাঁর স্বজাতি পথের ভিখারী কি কুলির সঙ্গে ভূরিভোজনে

পরাঙ্মুখ হন না। সুতরাং ইচ্ছে করলে অতি সহজে আমরা আমাদের এই জাতি-বৈষম্য ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারি। মান্ধাতা আমলের সেই সব পুরনো শাস্ত্রের বিধি-বিধান আজ ভেঙে আমাদের গুঁড়িয়ে দিতেই হবে। তার জায়গায় আজ গ্রহণ করতে হবে নতুনকে। আমরা সব ভারতবাসী জীবনের প্রাণস্পন্দনে ভরপুর। সহজভাবেই গ্রহণ করতে পারব।'

'কি যে বলছেন আপনি কিছু বুঝতে পারছি না।' বসির বিরক্ত হয়ে বলেন।

'বলছি, আমাদের জাতিভেদ প্রথার সব বাধা-ব্যবধান চূর্ণ ক'রে দিয়ে মানুষ আর মানুষকে এক করতে হবে। বলছি, জাতিভেদ প্রথা আমরা ভাঙ্গব ; জন্ম-জন্মান্তর ধরে একঘেয়ে পৈত্রিক পেশার সংকীর্ণ গণ্ডী যাব ডিঙিয়ে। প্রত্যেক মানুষেরই সুখ-সুবিধা সমান অধিকার নেব স্বীকার ক'রে। মহাত্মা অবশ্য তা বলেন না। কিন্তু ভারতে বৃটিশ পিনাল কোডের দৌলতে জাতিভেদ প্রথার সামাজিক কৌলীন্য আর অটুট রইল কোথায়? সকলেই আজ সমান আইন-আদালতের চোখে। জাতিভেদের গণ্ডী-রেখা আজ কেবল পৈত্রিক পেশাতেই সীমাবদ্ধ। ধাঙড়রা যদি তাদের জাত-পেশা ছেড়ে অপর কোন ব্যবসা গ্রহণ করে, কেউ তখন তাদের আর অচ্ছুত বলে ডাকবে না। এবং শিগগির সেদিনই আসছে। বিদেশী কল-কব্জা আর যন্ত্রপাতি আমদানী করতে গিয়ে প্রথমেই আমরা নজর দেব, যাতে কাউকে আর নিজ হাতে গু-মুত ঘাঁটতে না হয়। টাট্টিখানাগুলিতে প্রথম আমরা 'ফ্লাশ'-ব্যবস্থা চালু করব। ধাঙড়রা তখন অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক-কালিমা থেকে মুক্তি পাবে। মর্যাদা লাভ করবে শ্রেণীহীন সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় নাগরিক হিসাবে।'

'আর ধাঙড়দের একনায়কত্ব—মার্কসীয় বস্তুবাদ এবং আরও কত কি প্রতিষ্ঠিত হবে!' ব্যঙ্গ ক'রে হেসে উঠলেন মিঃ বসির।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ধীরে ধীরে সব কিছুই হবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে, যান্ত্রিকভাবে নয়। সস্তা বুলি কপচিয়ে আর লাভ কি?'

'অল্‌রাইট, বেশ সেই ভালো। কিন্তু এখানে আর নয়। দম যেন আটকে আসছে। চলুন, এখন যাওয়া যাক্।' মিষ্টার বসির পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বার ক'রে মুখ মুছতে লাগলেন।

আশপাশের জনতা এতক্ষণ ধরে ওদের দু'জনের কথাবার্তা শুনছিল অবাক বিস্ময়ে আর আড়চোখে তাকাচ্ছিল পরস্পর পরস্পরের দিকে। ওরা এবার বিদায় নিতে কিছুদূর পিছু পিছু গেল ওদের সঙ্গে সঙ্গে। তারপর গোলবাগ থেকে নিজেরাও বেরিয়ে এসে যে-যার গন্তব্য পথ ধরল।

বথা ছোঁয়া-ছুঁয়ির হাত বাঁচিয়ে তফাতে গিয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল আর ছোকরা কবির কথাগুলি ভাবছিল। ছোকরা কবিটি যেন তাঁর মনের গোপন কথাটি বলেছেন। নিজ হাতে ওকে আর তা হলে অপরের গু-মূত সব ঘাঁটতে হবে না! কিন্তু 'ফ্লাশ'-ব্যবস্থাই বা কেমন ধরনের? 'ভদ্দর লোক'টা তাকে জোর ক'রে টেনে না নিলেই ভালো হতো। ব্যাপারটা কি ও তা হলে তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে পারত।

অস্তগামী সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্ত রাঙিয়ে তুলেছে রঙে রঙে। গৌরিক-বসনা আকাশের দিকে বথা তাকায় চোখ তুলে। বাহির বিশ্বে রঙের কি বিপুল বিচিত্র সমারোহ! বুকটা ওর কেমন যেন মুচড়ে ওঠে। অপূর্ব এক স্পন্দন সর্বাঙ্গে তার খেলে যায়। কি করবে, কোথায় যাবে ও—কিছুই ভেবে উঠতে পারে না। সকাল বেলাকার তিক্ত স্মৃতিগুলি আবার চিতিয়ে উঠে মনের আনাচে-কানাচে হানা দেয়। গাছতলায় ও স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ ক্লান্ত অবসন্নের মত। মাথাটা ওর ঝুলে পড়ে বুকের ওপর। মহাত্মাজীর বক্তৃতার শেষ কথাগুলি কানের কাছে ওর প্রতিধ্বনি তুলতে থাকে: 'প্রার্থনা করি, ভগবান যেন তোমাদের মনে শক্তি দেন, তোমরা যেন তোমাদের আত্মার অন্তিম মুক্তির কাজ সম্পূর্ণ ক'রে যেতে পার!'··· আত্মার অন্তিম মুক্তি? তার কাজ? বথার কেমন ধাঁধা লাগে। ও শুধাতে থাকে বার বার। কিন্তু কোন জবাব খুঁজে পায় না। গান্ধীজীর মুখখানা অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে যায় ওর

চোখের উপর। দুর্বোধ্য ঠেকে কেমন যেন। তবু ও দমে যায় না। কে যেন ওর মনে শক্তি দেয়,ওকে এগিয়ে নিয়ে যায় হাত ধরে। মহাত্মার বক্তৃতাটি আগাগোড়া ও একবার ভাবে। উকার কথাটা ওর মনে পড়ে। আশ্রমে এক ব্রাহ্মণ যুবক মেথরের কাজ ক'রে থাকে, বলছিলেন মহাত্মাজী। তার মানেই বা কি? উনি কি বলতে চান মেথরের কাজ আমি ক'রে যাই জীবনভর?—বখা আবার শুধায় নিজেকে।...হ্যাঁ, গান্ধীজী কিন্তু যা বললেন, আমি ঠিক তাই ক'রে যাব। তাঁর কথা অন্যথা করা চলবে না। টাট্টি সাফার কাজ আমায় ক'রে যেতেই হবে।... বখা নিজে প্রশ্ন করে, নিজেই জবাব দেয় জোরের সঙ্গে।...তা আমি করছি, কিন্তু ছোকরা কবিটি 'ফ্লাশ' না কি যেন একটা বললেন, যা হলে মানুষকে আর হাতে-নাতে কাজ-কর্ম কিছু করতে হয় না? তা বলুক—ও নিজেকে প্রবোধ দেয়—তা বলুক, গান্ধীজীর কথা কিন্তু অমান্য করা চলবে না।

ও হাঁটতে শুরু করে। মনের মধ্যে ওর তখন তুমুল ঝড় বইতে শুরু করেছে। অনুরণিত হচ্ছে শোনা বক্তৃতার কথাগুলি, যদিও বেশীর ভাগই ও ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি।

অস্তগামী সূর্যের ক্ষীণ স্তিমিত রশ্মিটুকু দূর দিক্-চক্রবালের কোলে মিলিয়ে যেতে না যেতে রাত্রির অন্ধকার তার কালো উত্তরীয়খানা বিশ্ব চরাচরের উপর মেলে দিল ধীরে ধীরে। কয়েকটি তারা নীল আকাশের বুকে হেসে উঠল।

গোলবাগের মাঠ পেরিয়ে বখা নেমে আসে ধূলি-ধূসরিত রাজপথে।

গোধূলি সন্ধ্যার মেদুর মুহূর্ত অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সহসা ও অপূর্ব এক প্রাণ-বন্যায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠে: 'বাবার কাছে গিয়ে গান্ধীজীর কথা আমি সব বলব। ছোকরা কবির কথাও জানাব। তাঁর সঙ্গে আমার একদিন নিশ্চয়ই দেখা হবে। সেই আশ্চর্য কলের কথাটি তখন জেনে নেব তাঁর কাছ থেকে।'

বাড়ির দিকে ও পা বাড়ায়।

সিমলা—ভায়সূরয় অব ইণ্ডিয়া জাহাজ—বৃন্দাবারী।
সেপ্টেম্বর—অক্টোবর, ১৯৩৩।